কবি-কাননিকা

কবি-কাননিকা

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত।

কলিকাতা;
২০১.নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

মহাশয়কে

'কবি-কাননিকা'

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

'কবি-কাননিকা' মনগড়া ছবি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে কেহ ইহার আদর্শ খুঁজিবেন না। অতিরঞ্জন-মূলক রহস্যই ইহার উপাদান। ইহাতে বাস্তবের আরোপ করিতে গেলে, পাঠক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের নাটক।

ফুলশয্যা	...	...	১৲
প্রেমাঞ্জলি	...	...	॥০

কবি-কাননিকা।

গৌরচন্দ্রিকা।

তরল জলদকবলিত পূর্ণচন্দ্রমা, রজনী প্রভাতকল্প,—কাকগুলা সমস্বরে কা কা করিয়া উঠিল। নরোত্তম শর্ম্মা শয্যা ত্যাগ করিলেন, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে তামাকুর ডিপা খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি ত আর শেষ হয় নাই, নিদ্রা এখনও শর্ম্মার গলা জড়াইয়া আছে, তামাকু খুঁজিতে আফিমের কৌটায় হাত পড়িল। সাজিয়া ব্রাহ্মণ একবার টান দিলেন, বুঝিতে পারিলেন না,—দুই বার তিন বার, তবুও বুঝিতে পারিলেন না; চতুর্থ বারে যখন তাহার জ্ঞান জন্মিল, তখন নেশা ধরিয়াছে। নরোত্তমের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। তখন পঞ্চম বারের প্রাণভরা টানে, সমস্ত ধূমরাশি হৃদিপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, গমনোন্মুখী রজনী সুন্দরীকে আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। চাঁদ একবার হাসিয়া একখানা বড় মেঘের ভিতর ঢুকিয়া গেল। রজনী তমস্বিনী। নরোত্তমের উটজ-প্রাঙ্গণের সমীরণে কতকগুলা ধুঁতরা ফুল ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম দেখিলেন, আঁধার সাগরে একটা নন্দন কানন ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটা পারিজাত বৃক্ষের তলে মাদুর বিছাইয়া

দেবগণ মুখামুখি করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। নরোত্তম কাণ বাড়াইয়া দিলেন।

নরোত্তম শুনিলেন, "কে যায়!"—

পদ্মযোনি কুমেরুর শৃঙ্গে একটা আগ্নেয় পর্ব্বতের কলিকা বসাইয়া, বাসুকির নল করিয়া মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। বিচারকের চক্ষু সর্ব্বদাই মুদিত, মুখবিনির্গত ধূমরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল; "কে যায়—এই অকালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে অপ্রস্তত হইতে মর্ত্তে কে যায়!" পদ্মযোনি একবার মাথা তুলিলেন, চারি দিক চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, তাই ত বিষম সমস্যার কথা—"কে যায়?"

প্রশ্নকর্ত্তা বলে "কে যায়", উত্তরকারী বলে "কে যায়।" সম্মুখে ভগ্নচতুষ্পদ ধর্ম্ম, পার্শ্বে বাতব্যাধিগ্রস্তা রোগিণীর ন্যায় মুহুর্মুহু কুন্থনকারিণী ধরণী, উভয়ের চক্ষে অনর্গল জলধারা—সমস্বরে উভয়েই বলিল, "যদি কেহই না যায় তবে উপায়।"

ধর্ম্ম ত গিয়াছে, পৃথিবীর যাইবার আর বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীর প্রিয় সন্তান বড় বড় জ্যোতিষিগণ গ্রহনক্ষত্রাদি সকলে অবিরাম দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বসিয়া আছে। অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী স্থান আছে কি না। চন্দ্রে পাহাড় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন। মঙ্গলে ভুবনব্যাপিনী তরঙ্গিণী, তরঙ্গ উঠিলেই প্রাণ যাইবে। উপায়;—কেমনে ধর্ম্ম ও পৃথিবী রক্ষা পায়! পদ্মযোনি নীরবে মুখ তুলিয়া একবার মহেশ্বরের মুখের দিকে চাহিলেন। কৈলাসনাথ তার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"আমা হইতে হইবে না—মর্ত্তে

গাঁজা আফিমের কমিশন বসিয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে যাইলে সকলে আমাকে ফূৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি সেথানে অপ্রস্তুত হইতে অথবা পাগলা গারদে প্রবেশ করিতে যাইতে পারিব না।” “অমরেন্দ্র তোমার কি?”—বলিয়াই চতুরানন তামাকুতে একটা টান দিলেন। “আমার কি? আমার সর্ব্বনাশ। যা লইয়া আমার অহঙ্কার, সেই ভীমনিনাদী অশনি, একটা লোহার শিকের প্রেমে মরিয়া আছে। তাহার উপর মর্ত্তের একটা অপোগণ্ড বালক পর্য্যন্ত বজ্রনির্ম্মাণ কার্য্যে পারদর্শী। পথে পথে তামার তারে আমার আদরিণী কবিকুলসোহাগিনী কাদম্বিনীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি কোন্ মুখ লইয়া মর্ত্তে যাইব।” মহেন্দ্র ব্রহ্মার দিকে আর চাহিলেন না, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নখ দিয়া হরিচন্দনের পত্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি বরুণের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। বরুণ বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আমার দিকে চাহ কেন প্রজাপতি। আমি কি সেই মহাশক্তিময় তাম্রতারের হেঁপায় পড়িয়া অম্লজান আর জলজান নামে দুইটা বাষ্প হইয়া আসিব?—আমি যাইব না।”

সন্তানকের পত্রান্তরাল হইতে অরুণ দেব উঁকি মারিতে-ছিলেন। প্রজাপতির সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। ধরিত্রীসুন্দরী ব্রহ্মার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “ঠাকুর দা ওদিকে চাহিও না, ওর বিদ্যা সেথানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্তবাসিগণ বুঝিয়াছে,—সূর্য্যের ব্যাস বৎসরে আঠার হাত করিয়া কমিয়া আসিতেছে, আর কিছুকাল পরে উহাকে আমারই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। চন্দ্রদেব বহুকাল হইতেই নারী হইয়াছেন, মানব

উহাকেও নারী বলিতে ছাড়িবে কি?” সূর্য্য লজ্জায় অস্তাচলের গুহার ভিতর মুখ লুকাইল। ব্রহ্মা আকুল নয়নে গোলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন গোলোকের দ্বার বন্ধ, পুরীর আর সে শৃঙ্খলা নাই, দ্বাররক্ষী জয় বিজয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সনক সনন্দ সনাতনের গান প্রবল ঝটিকায় ভাসিয়া গিয়াছে। ভগবানের অস্তিত্বলোপের জন্য ডিনামাইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্ট, এনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট নিরীশ্বরবাদিগণ জগতে ঈশ্বরত্ব রাখিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ এ রাজা মরিতেছে, কাল ও রাজা মরিবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কেহ বা আতঙ্কে জড় সড়, কেহ বা ভয়ে মর মর। ঘরের আরসুলা টিকটিকি পর্য্যন্ত সেই কসাইগুলার দলে যোগ দিয়াছে। ভয়ে রাজার রাজা, দেবতার দেবতা পদ্মালয়াকে লইয়া, পটোল মাথায় দিয়া কলমীশয্যায় অতি দীনভাবে অনন্তশয়নে শুইয়াছেন। কে তারে তুলিবে?

দেবগণ তখন একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল।—কি হইবে? অমর যে মরিবার নয়, অনন্ত দুঃখভার মাথায় বহিয়া অনন্ত প্রাণ লইয়া হতভাগ্যেরা কি করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন, “চল সকলে ধর্ম্মকে স্কন্ধে লইয়া সুমেরুশৃঙ্গে পলাইয়া যাই।”

দূরে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে? বাইজীর ভেড়ুয়ার ন্যায় রত্নালঙ্কার ভূষিত, অথচ মলিন বদন, সজল নয়ন, মরুণী মাসীর মত অনবরত কাশিতে কাশিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ও কে আসিতেছে—কে—ও, ধনাধিপতি কুবের নয়? কুবের

আসিয়া ধড়াস করিয়া পদ্মযোনির সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। পদ্মযোনি বলিলেন "এ কি ?—বলি উত্তর দিকপাল এ কি ? এই নাও তামাক খাও,—বলি ব্যাপার কি ? এমন করিয়া ছিন্নমূল তরুর মত আছাড় খাইয়া পড়িলে কেন ? বলি ওহে ভায়া কথা কওনা যে, ব্যাপার কি ? আমরা যে তোমার ওখানে যাইবার সংকল্প করিতেছি।"

"আর ব্যাপার—সমস্ত জগতের ধন আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া, আমার ঘরে ডিটেক্‌টিভ পুলিশ ঢুকিয়াছে, সুমেরুর গহ্বরে গহ্বরে তল্লাশ লাগাইয়াছে।"

"য়ঁ্যা য়ঁ্যা বলিলে কি ?"—দেবগণ সমস্বরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া হাঁ করিয়া কুবেরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলে—দৈত্যদানবের অগম্য, বিপন্ন দেবতার আশ্রয়স্থল সুমেরু অচলে মানুষে আরোহণ করিল ! ওহে কুবের পাগলের মত কি কথা বলিতেছ !"

'আর বলিতেছ',—কুবের বলিল, 'আর বলিতেছ'—যাহা দেবতা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল। সুমেরু-শৈলে মানুষ উঠিল, আমার ইজ্জত রাখা ভার হইল। বহু লোকে আজ বহু বৎসর ধরিয়া সুমেরু অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এত কাল একমাত্র তুষারবাণে সকলকে বিফল মনোরথ করিয়া আসিতে-ছিলাম, এমন কি সাহসিকুলচূড়ামণি মার্কিণ চতুর্ধুরীণ ফ্রাঙ্ক-লিনকেও যমের ঘরে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সাহসী নরকুলের গোঁ ফিরাইতে পারিলাম না। তাহারা একটা রথী-দম্পতী পাঠাইয়া দিল। এবারে তাহারাই সর্ব্বনাশ করিল। কি জানি কি কুহকে আমার প্রধান সহায় বিজয়ের একমাত্র

উপায় বরফ প্রান্তরকে বশে আনিল। সেই বিশ্বাসঘাতক বরফাধমই নরওয়ে নিবাসী ন্যানসেন ও তাহার পত্নীর জাহাজ বুকে আনিয়া আমার বাড়ীর দুয়ারে লাগাইয়া দিয়াছে; রক্ষা কর প্রজাপতি, অগতির গতি, আমার প্রাণ যায়।

সকলেই তখন গভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "যুদ্ধ কর যুদ্ধ কর।"

"চুপ কর চুপ কর, গোল করিও না, আমাকে বলিতে দাও।" ধনাধিপতি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া গভীর চীৎকারে সকলকে থামাইয়া দিল।—"কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? এ দেবদানবের যুদ্ধ নয়, রক্ষমানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কুকুরের সহিত যুদ্ধ করিতে কি সাহস কর? ওই দেখ, গোটা বার কুকুরে মহানন্দে চারিধারে ছুটাছুটি করিতেছে। ওই দেখ আমার শ্বেত ভল্লূককুল নির্ম্মূল হইল। যেমন যাইবে, ন্যানসেন ও তৎপত্নীর একটিমাত্র ইঙ্গিতে তোমাদের টুঁটি ধরিবে, আর রামও বলিতে দিবে না, গঙ্গাও বলিতে দিবে না।"

সকলে কুবেরের পানে ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল। নলরূপী ফোঁপরা বাসুকি লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কলিকার অগ্নি জলস্পর্শে নিবিয়া গেল। চারিদিকে শব্দ উঠিল—কেবল হায় হায়।

পটোলোপাধান কলমীদলে শয়ান ভগবান, ভক্তের এ দুঃখ আর সহিতে পারিলেন না। দেবগণ দৈববাণী শুনিল, মাভৈঃ ভয় নাই, আমি আসিয়াছি।

নব-জলধর-বিজরীরেখা চোঁৎ করিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মহেশ্বর বলিয়া উঠিলেন,—গোলোকনাথ একি? ক্ষীরোদতলবাসিনী সুধাভাণ্ডধারিণী দেবতায় অমর-

কারিণী মোহিনি, আবার কি ভোলাকে পাগল করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছুটাইবে! দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "দয়াময় এ কি ?"

দয়াময় বলিলেন, "এবারে এই, এবারে নারী অবতার।"

"হেনরী মার্টিনী, শ্নাইডার, টরপেডো, মাক্সিম্ কামান আবিস্কৃত হইয়াছে যুদ্ধ করিতে পারিব না, হোয়েল ফিশারি হইয়াছে মীন হইতে পারিব না, বরাহ হইয়া গুলি খাইয়া হ্যাম হইতে পারিব না, কূর্ম্ম হইয়া হোটেলের গ্লাসকেস শোভিত করিতে পারিব না। নরসিংহ হইয়া আলিপুরের পশুশালায় কে প্রবেশ করিবে? বৃন্দাবনবিলাসী হইয়া মেজেষ্টরের কাটগড়ায় কে উঠিবে? ভারতবর্ষে আর পয়সা নাই কে ড্যামেজ দিবে? আমি নারী হইব, নারী হইয়া পুরুষের তেজ ভাঙ্গিব। তোমরা নির্ভয়ে যে যার গৃহে গমন কর।" তখন,—

সগর্ব্বে রবাব বীণা বাজিল মুরলি
দেবগণ ঘরে চলে হরি হরি বলি।
নারী হল অবতার সমীরণ গায়,
মর্ত্তের পুরুষগুলা করে হায় হায়।
পর্ব্বত পাথর হ'ল, সিন্ধু হ'ল জল,
তারকা উজ্জ্বল হ'ল, গাছে ঝোলে ফল।
আগুণ গরম হল, ঠাণ্ডা হল হিম,
শর্করা মধুর হল তেঁতো হল নিম।
তফাত কেবল মাত্র মরুভূমে বারি,
রমণী পুরুষ হ'ল, নর হল নারী!

অবতরণিকা।

কাননিকা কান্তগির কবিরাজকুল কলঙ্কিত—শ্রীবিষ্ণু—উজ্জ্বল করিয়াছেন। চ্যবণপ্রাস, কস্তুরীভৈরব, ত্রিফলাকল্প, মকরধ্বজে মনুষ্যের আর উপকার হয় না বুঝিয়া, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে দেখিয়া, কাননিকা নূতন পথাবলম্বনে নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এলোপ্যাথীর কম্পজ্বর, হোমিওর পালা, আর আয়ুর্ব্বেদের সন্নিপাত; ইহাতে টেরাপ্যাথীর পাতাল গমন, হাইড্রোপ্যাথীর বিরেচন, ইলেক্‌ট্রোর বমন; ইহাতে রোগীর জ্বর-জ্বালা ত দূর হইবেই; অধিকন্ত ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা মরিবে, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসাপনোদন হইবে। শোকী আহ্লাদে নৃত্য করিবে, বিয়োগী আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হইবে। পতিহারা পতি পাইবে, অগতির গতি হইবে, মরণোন্মুখ নর ঔষধ-প্রভাবে মত্তমাতঙ্গের বল ধরিবে। আর কি হইবে?—ঔষধের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে।

লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্ত্তের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিতেছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়া পথেই আরোগ্যলাভ করিয়া, পথ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছে। কাহাকেও বা আসিতেও হইতেছে না; ঔষধের নাম শুনিয়াই রোগ-মুক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিকা, করাচী হইতে সিলেট, গিলঘিট হইতে সুন্দরবন, কাছাড় হইতে কোঞ্চী, সকল স্থানের সর্ব্ব জীবের মুখে এ ঔষধের গুণ ধরে না। নরনারী চীৎকারে, অশ্ব হ্রেষারবে, মাতঙ্গ বৃংহিত

ধ্বনিতে, গাভী হাম্বায়, ময়ূর কেকায়, কোকিল কূজনে, এমন কি ভ্রমর গুঞ্জনে, সমীর নিস্বনে ইহার যশোগান করিতেছে। ভারতে নূতনত্ব, মরে অমরত্ব,—সত্ব রক্ষার জন্য ঔষধ পেটেণ্ট।

এমন ঔষধ তোমার বিদিত না হওয়াই বিচিত্র। তবে গ্রহ-দুর্দ্দৈববশে বধির তুমি ঔষধের কথা যদি না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই যোগীঋষির অগোচর, স্বর্গদুর্ল্লভ ঔষধের নাম করিতে হইল। প্রথমেই সন্দেহের কথা। যোগী-ঋষিই যদি জানিতে না পারিল, তাহা হইলে এত জীব ঔষধের কথা কি প্রকারে জানিল? তদুত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আজিকালি বঙ্গবাসী আমরা এইরূপই জানিয়া থাকি। যাহা যোগীঋষি জানে না, দেবতাও শুনে না, তাহাই আমরা জানিয়া ও শুনিয়া থাকি। আমাদের দিব্য জ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দিব্য চক্ষু আছে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বসিয়া মুদিত নয়নে কল্পবৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাই। দিব্য কর্ণ আছে। সংসারের কোলাহলের মধ্যে বসিয়া, ভূমিকম্পান্দোলিত বিশাল সাগরের ভীম গর্জ্জিত তরঙ্গতীরে অবস্থিত হইয়া, আকাশের গান শুনিতে পাই। দিব্য ক্ষুধা আছে। সারের সার লক্ষ্মীরূপিণী ধান্য রাণীকে রাক্ষসের কবলে ধরিয়া দিয়া, সমীরণ-সেবনে উদর পূর্ণ করি। যোগীঋষির অজ্ঞাত গুহ্য কথা আমরা জানিব না ত জানিবে কে? অতি গুহ্য তন্ত্র-কথায় গৃহ গৃহ নিনাদিত।

তবে এ কথা কে না জানিবে? ভাই হে! তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। না জানিলে তোমার নিস্তার নাই। রঙ্গমঞ্চের লীলাময়ী ললিতার নবনীত-কোমল করাঙ্গুলীধৃত কুসুমকোমল চাবুকের আবেশকর প্রহারের ভয়ে, অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক

অভিনয় দেখিয়া বিরক্ত হইয়াও অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া থাকে। জানিতে শিখিতে অবাধ্যতা প্রকাশ করিও না। ইটালীর Inquisitionএ গালীলিয়োপ্রমুখ অনেক উদ্ধত পণ্ডিতকে 'সূর্য্য ঘুরিতেছে' এই কথা স্বীকার না করায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল। যাহারা ভয়ে তাড়নায় অথবা অবশেষে প্রাণের মর্য্যাদা বুঝিয়া স্বীকার করিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল। হতভাগ্য গালীলিয়োকে ঘোর অস্বীকারাপরাধে কারাগারেই অস্থিপঞ্জর রাখিতে হইয়াছিল। ভাই! বুঝিয়া সুঝিয়া সাবধান।

কাননিকা পঞ্চাবতার। কাননিকা কবি, আর তাহার অব্যর্থ আদি ও অকৃত্রিম ঔষধটির নাম কবিতা-রস। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল ঈশ্বরপরায়ণ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও কাননিকাকে দেখিয়া আর তাহার অনৈসর্গিক অথচ অতি কমনীয়, অতি মধুর হাবভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যদি কখনও ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহা এই রমণীরূপে। অধিক আর কি বলিব, কাননিকার অবতারণায়, নিরীশ্বরবাদী পৌত্তলিক হইয়াছে, চার্ব্বাকের দল ঋণ করিয়া ঘি খাইয়াছে, কর্ত্তাভজা গৃহিণীর শরণ লইয়াছে, কমৃতির (Comte) দল বাড়তি হইয়াছে, নবদ্বীপের প্রেমাশ্রুজলে সুরধুনী ত্রিশ ফুট ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর পরমহংসী পরমবক হইয়া আধ্যাত্মিক মাছ ধরিতে আটলাণ্টিক পারে উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু রমণীকুলে হুলস্থূল। ঈর্ষ্যায় আকুল হইয়া সকলে বক্ষে করাঘাত করিতেছেন ও মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন। ব্রাহ্মণী কঙ্কণ বেচিয়া বাইবেল কিনিলেন, খৃষ্টানী পশ্চিমমুখে বসিয়া নেমাজ

পড়িলেন, মার্কিনী থান ধরিলেন ; সাধারণী অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিলেন, আদি বাঁদী হইলেন। "ঈশ্বর নারী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবে!—পোড়া কপাল সে ঈশ্বরের, আমরা ঈশ্বর মানিব না।"

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ। ঔষধের গুণাগুণ লইয়া তর্ক করিতে চাহি না, কবি হও বুঝিতে পারিবে। তবে একান্তই যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী যাহার কাছে যাও, সেই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। বিলাসী দেশীয় রাজার অত্যাচারে যে ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া যাইত, তুলিবার লোক নাই বলিয়া সেই কাব্য-কুসুম এখন ঘরে ঘরে ফুটিতেছে, পথে পথে গড়াইতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িতেছে।

কবিতা লেখে না কে? কাব্য বুঝে না কে? নারী হইয়া যদি তুমি বুঝিতে না পার, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার প্রভু বাজার-সরকার-শিরোমণি। পুরুষ হইয়া যদি বুঝিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার গৃহিণী তোমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী, রন্ধনশালার পঞ্চাল-নন্দিনী। বুঝিতে না পারিলেও বুঝিয়াছি বলিতে লজ্জিত হইও না। ভাই হে বুঝিয়া রাখ, কাননিকা কবি।

কবি না বলিয়া কি বলিব? কবি শব্দ স্ত্রীত্ব-বাচক হয় না জানি, তথাপি কাননিকাকে কবি না বলিয়া কি বলিব? মনে যে কত কথা আসিয়া পড়ে, ব্যাকরণের জাতেরস্ত্রাদীপ, ইদন্তাদীপবা, গার্গ্যান্তাঃ—কত সূত্রের ছবি জাগিয়া উঠে! কিন্তু হায় নিরুপায়, কাননিকাকে আমরা কোন সূত্রে কিছু করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণে, অভিধানে মানুষের পাণ্ডিত্যাভিমানে—দশ দিক বন্ধনে কাননিকাকে কবি বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

হায়, দেবভাষা সংস্কৃত! তখন যদি জানিতে, এই ভারতে কবিতা-রসময়ী নারী জন্মগ্রহণ করিবে, হৃদয় ভরাইবে, ভুবন মাতাইবে, আর জানিয়া শুনিয়া যদি একটা অভিধান দিয়া যাইতে, তাহা হইলে লিঙ্গ নির্ণয়ে আমাদের এত লজ্জায় পড়িতে হইত না। যদি জানিতে ডুমুরের ফুল হইবে, কল টিপিলেই জল হইবে, তাহা হইলে পাণিনিকে লইয়া আর টানাটানি করিতে হইত না অথবা ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষি অনেক বুঝিয়া, সমাধিবলে ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া নারীকেও পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যাহার হৃদয়কন্দরে কোটী কোটী নর নারীর সোণার কাটি রূপার কাটি নিহিত আছে, সে পুরুষ হইল না, আর যে যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিয়া গমনে বিরত, এমন দুর্ব্বল তুমি হইলে পুরুষ! তবেই স্থির হইল, কাননিকা কবি। এমন কবির জীবনচরিত লিখিয়া লেখনী সার্থক করিব। সকলে আমার সহিত যুক্তকরে বল :—

যত্ন ক'রে ভাঁজিয়াছি গৌরচন্দ্রিকা,
আদরে সাধিয়া দিছি অবতরণিকা।
এই পাপভরা মর্ত্তে করিয়া ভূমিকা,
নাবালিকা আদি লীলা শেষ বিসূচিকা
দেখাইতে রঙ্গে ভঙ্গে এস কাননিকা।
ফুল দেব শত শত জবা শেফালিকা,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব মাছ কুটলে মুড়ো দেব
সোণার থালে ভাত দেব—আর দেব নিকা,
ছন্দের মিলের তরে ওগো কাননিকা!

ভূমিকা।

কাননিকার ভূমিকা, ভরা অমাবস্যার নিবিড় তিমিরাম্বরা নিশীথ যামিনী। সেই সময়ে শনিশুক্রাদি গ্রহগণ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া মীনরাশিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ভূতভাবন ভগবান ভুবনের ভার হরণ করিবার জন্য মথুরা নগরে কংস-কারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকার জন্মের পর জ্যোতির্ব্বিদ-মুখে সময়ের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং বালিকার ক্রন্দনের কিছু বিশেষত্ব শুনিয়া, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই ভাবিলেন, বুঝি অন্তঃপুরবদ্ধা নিত্যপীড়িতা ভারত-ললনার দুঃখ দূর করিবার জন্য ভগবান এবার নারীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অমনি সকলের চক্ষু খুলিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসমা নন্দিনী, সেন-কুলে জন্মিয়াও বৃন্দাবনে নন্দের বোঝা মাথায় লইয়া, মাথায় চূড়া ও কটীতে ধড়া পরিয়া, নরাকৃতি গাভীকুল প্রহার করিতেছেন। মাতা দেখিলেন, তাঁর সাধের গোপালী সুবল সুদাম দাম বসুদামাদি গোপবালকগণে পরিবৃতা হইয়া, তুরঙ্গোপরে এক হস্তে বল্‌গা, অন্য হস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া, বকাসুর সংহার করিতেছে।

রমণীকুল দেখিল,—তাহাদের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন হইল। উইলবার ফোর্স, ক্লার্কসন আজীবন ললাট-স্বেদ পাদমূলে নিক্ষেপ করিয়াও, বিনা অর্থরাশি ব্যয়ে যে দাসত্ব প্রথা উঠাইতে পারেন নাই, গোপালীর জন্মমাত্রেই সেই ভীষণ দাসত্ব-প্রথা ভারত হইতে উঠিয়া গেল।

দিব্যচক্ষে সকলে দেখিল,—রমণী পুরুষের স্কন্ধে উঠিয়াছে।

গড়ের মাঠে শ্যামল তৃণে ফুল ফুটিয়াছে। প্রান্তরচারিণী কুল-কামিনীর চরণপঙ্কজমধুপান-বিহ্বল ফুটবল আপাদকণ্ঠোদর দ্বি-গুণ ফুলাইয়া তৃণকুঞ্জে গা ঢালিয়া নীরবে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ক্রিকেট-উইকেট প্রকৃতির রীতি লঙ্ঘন করিয়া দুলি-তেছে। চপল টেনিস বল, বিদ্যালয়-কারামুক্ত, "নব-পাশ"-গ্রস্ত যুবকের মত ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া গগনমার্গে ছুটিতেছে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের আর এক পর্দ্দা উঠিয়া গেল। সকলেই তখন দেখিল,—ষ্টেশনের "ষ্টীম-এঞ্জিন" রমণীপাদস্পর্শ-মাত্রেই মত্ত ঐরাবতের বল ধরিল। ভীম হুঙ্কারে বহুকালের হৃদয়-নিহিত দুঃখরাশি উদ্গার করিয়া বাষ্পীয় রথ মনোরথ-বেগে ছয় মাসের পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রি-মূলে উপনীত হইল। আনন্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা সপ্তস্বর্গ ভেদ করিয়া মাথা তুলিল। পিক কুহরিল, ভ্রমর গুঞ্জরিল, ঝিল্লী ঝিঁঝিল। মানস সরোবরে আবার নীলোৎপল ফুটিল। উত্তর গগন প্রান্তের রঙ্গ-ময়ী "অরোরা বোরিয়ালী" দুর্জ্জয়লিঙ্গে ছাউনি করিল। সংসা-রের কোলাহল হইতে বহু দূরে অবস্থিত, গিরি-প্রবাসী যোগিবর ভূমিবিলম্বিনী তুষার-সিক্ত সুবর্ণজটায় শিরোবেষ্টন করিতে করিতে শঙ্করের ধ্যান ভুলিয়া গাহিল,—"দীর্ঘকাল পরে কেন এ ভাব আবার? কেন এ কটাক্ষ লালসার?" হিমালয় লালসা-স্পর্শে বিকম্পিততনু যোগিবরের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিল।—

গন্ধাঢ্যেয়ং ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিত-মধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত॥

কুমারিকা নীহারিকাকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই ল্যাভেণ্ডার! প্রেমময় বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পুরুষের প্রভুত্ব দুর্গ এইবার

বুঝি ভূমিসাৎ হইল।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে একান্তে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়-মুখ-নিঃসৃত গীতামৃত পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস সঞ্জয়! নারায়ণ ওটা কেমন কথা কহিলেন?" তখন সঞ্জয় নিজের ভ্রম বুঝিয়া, কথাটা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "নারায়ণ বলিলেন,—

"পরিত্রাণায় নারীনাং সমাজদলনায় চ।
নারীদেহে ভরং কৃত্বা সম্ভবামি কলৌ যুগে॥"

সুখের পাঁচ মাস দেখিতে দেখিতে যেমন কাটিয়া যায়, তেমনি কাটিয়া গেল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে বালিকা কত হাসিল, কত কাঁদিল, কত মাটি খাইল। মাতা তাহার মুখে একদিন ব্রহ্মাণ্ডই দেখিয়া ফেলিল। এইরূপ হাসিতে, কাঁদিতে, মাটি খাইতে, ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে বালিকার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল।

নামকরণিকা

ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও নোলকধারণ। এই দুয়ের সঙ্গে চিরাগত প্রথানুসারে নামকরণও হইয়া থাকে। পুত্রবধূর সাতটি সন্তান একটি একটি করিয়া পুতনা-রাক্ষসী ও লিভর-রাক্ষসের করাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে;—পিতামহী তাই বাবাঠাকুরের দ্বার ধরিয়াছিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠমাত্রেই পৌত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন, "বাবাদাসী"। মাতামহী অবশ্য এ নামে তুষ্ট হইলেন না। কিন্তু কি করেন, বৈবাহিকার সম্মানরক্ষার্থ অনেক বিবেচনা করিয়া, বাবাঠাকুরের নাম পঞ্চানন্দে পরিবর্ত্তন করতঃ এই অষ্টম গর্ভের বাবাদাসীর নাম রাখিলেন, "পঞ্চাননী"। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দিবালোকে নাম-কুসুমকাননের ভিতর হইতে, একটা টগর আর একটা বক ফুল তুলিয়া আনা হইল দেখিয়া, চারি দিক হইতে একটা মহান্ হলহলা উপস্থিত হইল। মামী চক্ষু মুছিল, মাসী নাক ঝাড়িল, গঙ্গাজল পেট ফুলাইল; বকুলফুল ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বর্ণলতার নাম হইল ধুতুরা! এ কাহারও প্রাণে সহ্য হইল না। পিতামহী মাতামহীপ্রদত্ত নামের উপর চারি ধার হইতে অজস্র বচন-ছর্‌রা নিপতিত হইতে লাগিল। অতি মূর্খেও বুঝিল, নামের প্রাণ বুঝি আর টেকে না।

নামকরণের দিবস চারি দিক হইতে কাতারে কাতারে লোক আসিতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্ত্যে ব্যাণ্ড। তখন

যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছা ধন'।
প্রমোদা রাখিল নাম 'কুসুমকানন'॥

মামীমা আসিয়া নাম থুইল 'পারুল'।
মাসীমা থুইল নাম 'লেভেনিয়া ফুল'॥
মাসীমার পাউডার ছুটিয়া আসিয়া।
থুইল 'মিঠাই' নাম বাছাই করিয়া॥
বালিকার মুখ দেখে মাতুলের শালী।
আদর করিয়া নাম রাখিল 'দুলালী'॥
মানিনী মোদক বি. এ. মুখে মধুভরা।
মধুকল্প বাছা নাম দিল 'মনোহরা'॥
কুঞ্জবালা নাগ এম. এ. কেতাব খুলিয়া।
সিলেক্ট করিয়া নাম দিল 'অফিলিয়া'॥

কেহ বা নাম রাখিল 'লবঙ্গলতা', আবার কেহ বা রাখিল 'কপির পাতা'। এইরূপ কত লতা পাতা ফুল, কত ভৃঙ্গ-পাখী-কুল, গিরি নদী উপকুল, প্রমদাগণের প্রেমাকর্ষণে সেন-ভবনে আসিয়া অনঙ্গ হইয়া নাম-সাগরে ডুবিয়া গেল। কত কুটুম্বিনী, কত গঁদান সম্পর্কীয়া কামিনীকুল আসিয়া, মণ্ডলাকারে বালিকায় ঘেরিয়া বালিকার গায় নামসুধা ঢালিয়া দিল। উড়ুপোপম ক্ষুদ্র-বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই দুস্তর নাম-সাগর পার হইব?

কিন্তু কাননিকা নাম রাখিল কে? কে রাখিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অন্নপ্রাশনের পর যে দিন বালিকা শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভুজঙ্গগমন ছাড়িয়া, প্রথম হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল, যে দিন উঠিয়া পড়িয়া, ছুলিয়া ঢলিয়া আগু পাছু দুই এক পদ চলিতে শিখিল, সেই দিনেই কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বালিকা গৃহপ্রাঙ্গণস্থ ক্রোটনকুঞ্জে যাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়াছিল। যে দিন হামা-

গুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সেই দিনেই শিশু সভয় পদে অভয় ভর দিয়া, চপলাচমকে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া, আইভি-লতার অন্তরালে দণ্ডেক সময় লুকাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বালিকার এই অত্যাশ্চর্য্য কানন-প্রীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বালিকার সহিত কাননের প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ আছে অনুমান করিয়া, কাননিকার জননীর ভগিনীর ননদিনীর প্রাণসজনী হেলেনা, বালিকার নাম রাখিল,—কাননিকা।

অমনি কে যেন কোথা হইতে আসিয়া, কেমন করিয়া গোলাপ মল্লিকাদি কুসুমরাশি সেনেদের অন্তঃপুরস্থ যোষিৎমণ্ডলীর পদপঙ্কজে ঢালিয়া দিল। সমীরণ স্বন্ স্বন্ বহিল, হুতাশন গন্ গন্ জ্বলিল, বৃন্তচ্যুত যূথিকা ঝর্ ঝর্ ঝরিল। আর সন্ধ্যা-কালের অরুণিমগগনবিহারিণী হিরণ্ময়ী কাদম্বিনীকুল ধীর সমীরে অঙ্গ ভাসাইয়া, তরতর করিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল, নামকরণ এইবারে ঠিক হইয়াছে।

নাবালিকা।

কাননিকার বাল্যলীলা লিখিব কি?—কিম্বা তোমাকে একেবারে সেই প্রেমময়ীর যৌবন-তটিনীর তরল তরঙ্গে হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া দিব? সংসারের দুঃখভারাক্রান্ত তুমি পড়িতে পড়িতে ডুবিয়া যাও! যদি কখন বাঁধন খুলিয়া ভাসিতে পার, তরঙ্গ প্রহারের তাল সামলাইয়া উঠিতে পার ত বৃকোদরের বল পাও। না পার ত সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইলে! কিন্তু হায়! পোড়া রসাল যে গাছে ফলে! তুমি আমি তার তলে, সেই সিন্দুর-রাগরঞ্জিত—দেখিতে সুন্দর কিন্তু ক্ষুরধার-দশন কাঠবিড়াল-খণ্ডিত পক্ক রসালটীর প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকি। কখন ভাবি হায় রে রসাল! তোরে বৃন্ত বন্ধনে বাঁধিল কে? বাঁধিলই যদি, কেন তবে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত আমার গৃহপ্রাঙ্গনে, আমার অনুন্নত পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায় আনিয়া বাঁধিল না? আমি হস্তপ্রসারণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। কখন ভাবি, এমন বিশ্রী, নীরস, দদ্রুসমাচ্ছন্ন সহকার-স্কন্ধে, এমন দিগন্তপ্রসারী কঠিন শাখায় এমন সোনার ফলটী রাখিল কে? রাখিলই যদি, ফলটীকে মাকাল করিল না কেন? কাঠবিড়াল কাছে বসিয়া করলেহন করে; পাখী পাখা ঝাড়িয়া, মাথা নাড়িয়া প্রলাপ বকে; তুমি নিম্নে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পাখী বিড়ালের রঙ্গ দেখ, আমি কল্পনার আকর্ষী দিয়া ফলটীকে আমার কুঞ্জে আনিয়া তাহার হৃদয়ে একটু মধু ঢালিয়া দিই।

ভাই হে বিধিবিড়ম্বনা! এই সহকারেই সোহাগ ভরে,

শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় জড়াইয়া, মাধবীলতা প্রাণ পায়। এই সহকারশিরেই প্রভাতসমীরে তরঙ্গ তুলিয়া, বসন্তবিনোদী পিকবর ললিত পঞ্চমে গান গায়। ভাই হে!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ যায় না হটে।
যেইখানে চন্দ্রমালা সেইখানে কটে॥

অনেক দুঃখে মানব কল্পনার আশ্রয় লয়। ছলনা বঞ্চনার লীলাস্থল সংসারক্ষেত্রে পা বাড়াইতে সাহস না করিয়া, কত অকেজো পাগল ঘরে বসিয়া আকাশকুসুম দেখিতে ভালবাসে। তাই ত, সহকারতলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে উর্দ্ধে চাহিয়া বলি, 'ভাই অতি সৌরভ! দুলিতে দুলিতে গলিয়া যাও। আর যেন তরু তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। সুধারূপিণী তুমি ঝরিয়া ঝরিয়া, এই হতভাগ্যের বদন কাম্যকূপে ঝাঁপ খাইয়া ডুবিয়া মর। মরিয়া 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' হইয়া আমার হৃদয়-রাজ্যের দুর্বৃত্ত প্রজার দমন কর। তোমার আকস্মিক পতন প্রহারে মরিয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি মরিতে মরিতে মরিব না। ইচ্ছা-মৃত্যু লইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুইয়াও, সহস্রবাণ-বিক্ষত কলেবরে আহা উহু মরি মরি করিতে করিতে, যতদিন পারি, বাঁচিয়া রহিব। তাই বলি, মধুভরা কাব্যরসের আকর, অন্ত-র্নিহিত কাব্যভ্রমর কাননিকার যৌবন-রসাল! কেন তুমি নীরস, অমসৃণ বাল্য-তরুশিরে অবস্থিত হইয়া সমীরণ সোহাগে দুলিতে দুলিতে তরু মার্জ্জার আর পরভৃত পিকবরের লালসা বৃদ্ধি করিবে? তাহারা গাছ হইতে গাছে ফেরে; ফল হইতে ফলে যায়। আর আমরা কেবল তোমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। আমা-দের কামনা কি পূর্ণ হইবে না? ভাই উতলা হইও না।

একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমালোচনার তীক্ষ্ণ দর্শনে অবতারের বাল্যলীলা-বর্ণন-পথে অনেক আবর্জ্জনা কণ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাল প্রান্তরের সীমান্তে অবস্থিত অমর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এত দিন পরে স্বরচিত ব্যাসকাশীতে আসিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল যমুনাশীকরসিক্ত সুধাভাণ্ডটী সকলে মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। মহাভারত-রচয়িতা শ্রীমদ্ভাগবতের সত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদের তীব্র কটাক্ষে রাসেশ্বরীর কোমল প্রাণ বুঝি আর টিকে না। দুই দিন পরেই শ্যামের বাম খালি হইবে। আমি নরোত্তম শর্ম্মা এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বিশাল বঙ্গে যে কেহ কৃষ্ণকে অবতার বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিয়া থাক, সকলে এই বেলা মৎসমীপে আবেদন কর। বালক হও, অশীতিপর বৃদ্ধ হও, রসসাগর যুবক হও, কিম্বা হাস্যময়ী লাস্যশালিনী রসতরঙ্গিণী যুবতী হও, অথবা রক্তদন্তা দীর্ঘকর্ণা শূর্পনখা বর্ষীয়সীই হও, তোমাদের মধ্যে আরাধনে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকেই শ্যাম-বিলাসিনী করিয়া দিব। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মত পেঁচি অহিফেনসেবী নহি। সে প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ খাইয়া কেঁড়ের মাপ লইয়া গোল করিত, আমি দাম দিয়া দুধের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। আমাকে অবিশ্বাস করিও না।

আর এক কথা। কোন অবতার বাল্যলীলা দেখাইয়াছেন? ভূবিজয়ী পরশুরামের দেবত্ব-বিকাশ ক্ষত্র-সংহারে, বামনের বলিছলনে, হরধনুর্ভঙ্গে ও ভার্গবের দর্প-চূর্ণনে আদর্শরাজ রঘুকুলেশ্বরের দেবাত্মার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। গভীর রজনীতে পতি-পার্শ্বগতা স্বপ্নাঙ্ক-সুখশায়িনী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া গৌতম-কুল-

চন্দ্রমা সন্ন্যাসাবলম্বনে ন্যগ্রোধতলে যৌবনস্ফুটিতা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। মেরীনন্দন ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে, মহম্মদ চত্বারিংশতে, প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া, নিজ নিজ দেবত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে এই সকল মহাপ্রাণ আকাশকুসুমের মত মানব অগোচরে ফুটিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট আকাঙ্ক্ষিতের মত ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন নাই বলিয়া, সকলেরই জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। তবে কাহারও বা সূতিকাগৃহে স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল, কাহারও বা সূতিকাগৃহপার্শ্বে, সহসোদিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চল-তারকা-পরিচালিত মেজাইগণ (magi) আগমন করিয়া, সমবেত স্বরে ভগবৎসন্তানের যশোগান করিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জিহোদীয় দেবমন্দিরে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করতঃ, আবার আঠার বৎসর পরে গালিলীসাগর-বিধৌত শ্যামল প্রান্তরে দণ্ডায়মান ঈশ্বরসন্তান আন্‌দ্রুপ্রমুখ ভ্রাতৃবর্গকে জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। যিশুখ্রীষ্ট এই অষ্টাদশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কোন 'সুসমাচার' পড়িয়া কে কবে কি জানিতে পারিয়াছে?

তবেই হইল, অবতারের বাল্যলীলা নাই। কাজেই আমাদের কাননিকা জন্মমাত্রেই গিরিপ্রস্রবিণীর মত অন্তরে অন্তরে রসিয়া, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সৈকত পুলিনে পশিয়া, ভাদ্রের গাঙের মত একেবারে ভরা যৌবনে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি মুণ্ডপাতের হাসি হাসিতে হাসিতে, 'ভাঙ কুল ভাঙ কুল' করিতে করিতে আসিয়া পড়েন, এইটাই না তোমার কামনা? কিন্তু তাহা আর হইল কই?

কাননিকার বাল্যলীলায় পূর্ব্বরাগ আছে; প্রেম-বৈচিত্র্য

আছে; দিব্যোন্মাদ আছে! ইহা ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর পেটেণ্ট প্রেমরঙ্গ হিষ্টিরিয়া আছে। তাহার উপরে আছে লোক-সমক্ষে অশ্রুজল, আর অন্তরালে জীবননাশী, সখী সখার কর-পীড়নে মুচকি হাসি। সবই যদি রহিল, তবে নাই কি? সেই গোচারণের মাঠ আছে, কিন্তু গোধন নাই। সেই গোবর্দ্ধন গিরি আছে, কিন্তু ধারণ নাই। নব নারীর বদলে নব নর আছে, কিন্তু বারণ নাই। সেই যমুনার জল আছে, কদম্বের তল আছে—সন্তরণ আছে, কিন্তু হায় আরোহণ নাই। আর সেই কুটিলার ভাই গর্দ্দভকুলের চাঁই আয়ান আছে, কিন্তু ত্রিজগতে তার স্থান নাই।

সকলেই স্থির করিল, বালিকা শশিকলার ন্যায় বাড়িবে; কিন্তু কাননিকা সকলকে লজ্জিত করিয়া কদলীবৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ, দুই বৎসরে তিন; তিনে পাঁচ; পাঁচে আট; আটে একাদশ বৎসরে উপনীত হইল। দ্বাদশে কাননিকা ষোড়শী। তিন বৎসরে বালিকার হাতে তুলি ও পেন্‌সিল হইল।

তিন বৎসরে বালিকা কত কি শিখিল। পঞ্চম বৎসরে বায়না ধরিল। সে বড় বিষম বায়না। এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ-ছাদোপরে মাতামহীর হাত ধরিয়া বালিকা পদচারণ করিতেছিল, এমন সময় পথপার্শ্বস্থ উদ্যান ভিতরে একটী বকুল বৃক্ষের অন্ত-রাল হইতে পূর্ণিমার চাঁদ, বালিকার পদনখের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদ গুলাকে দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। কিন্তু হায়! হতভাগ্য শশী, মাতামহীর কাছে আত্মগোপন করিতে পারিল না! মাতামহী অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দৌহিত্রীকে চাঁদ দেখাইল।

বালিকার অমনি চাঁদ ধরিবার সাধ হইল। হাত ছিনাইয়া চাঁদকে ডাকিল। চরণে স্থান পায় নাই বলিয়া, দারুণ অভিমানে, অভিমানী শশধর এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে লাগিল; আর তরতর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শশী ধরা দিল না বলিয়া, কাননবালা মাতামহীকে চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিল। "চাঁদ কিরে ধরা যায়?" বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাতামহী ফুল দেখাইল, ফল দেখাইল, মুখ চুম্বিল, গা নাড়িল। কিছুতেই কিছু হইল না। বালিকার সুর, গ্রাম হইতে গ্রাম, শেষে নগর ছাপাইবার উপক্রম করিল। তখন "গিরিবর! আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।" গিরিবর আসিলেন, উমাকে মুকুর দেখাইলেন। কিন্তু হায়! এ উমা ত নগেন্দ্র-নন্দিনী নয় যে, "মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিবে মহা সুখ, বিনি-ন্দিত কোটী শশধরে"। শেষে যে যেখানে ছিল, সব আসিল; কিন্তু কিছুতেই বালিকার বায়না থামিল না। ছাদ হইতেও নামিল না; চাঁদ চাহিতেও ছাড়িল না। সহসা কোথা হইতে নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, নয়নাভিরাম, সুগোল, সুডোল, একটী বালক আসিয়া একবার সলিলাপ্লুত বালিকার মুখপানে চাহিল। তার পর চাঁদের পানে চাহিল। তার পর গাহিল, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" অমনি, আগুনে জল পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া বালকের মুখ পানে চাহিল। কিন্তু হায়! সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সে বালক দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল। সবাই চক্ষু মুছিয়া ভাবিল, চোখের ভ্রম।

রসিকা।

সুরুচি, বঙ্গভাষার অস্তিত্বলোপের বায়না করে; সে ভাষায় নিধু বাবুর টপ্পা আছে। মানিনী কবিকুলের মুণ্ডপাতের বায়না করে; কাব্যকাননে রাম বসুর বিরহ আজও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। ভ্রমর গোলাপকে পাহাড়ে পাঠাইতে বোঁ বোঁ করে; গোলাপ তাহার ভার সয় না। কমলিনী স্থলে উঠিতে লালায়িত, জলে হিল্লোলে তাহার প্রাণ রয় না। কবি রমণীমুখের ছাঁচ তুলিবার সাধ করেন;

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশীকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥"

কাননিকার চাঁদ ধরিবার বায়না। বুঝি বালিকা বুঝিয়াছিল, শশি-করে কমল শুকায়, বিরহীর কলেবর দগ্ধ হয়। বায়না করে না কে? তোমার বায়না নাচ 'বলে', তোমার 'তিনি'র বায়না 'পোলো' খেলে। বায়না ছাড়া কে? সয়তান ঈশ্বরত্বের বায়না করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। কংগ্রেস Simultaneous Examination এর বায়না ধরিয়া কত গালই না খাইল। আয়রল্যাণ্ড হোমরুল লইয়া দেশ মাতাইল। সেই সঙ্গে রেডিকেল লর্ড হাউস্ উঠাইবার বায়না ধরিল; তাণ্ডব নাচে নাচিল। বায়না কোথায় নাই? কোমলার কোমল হৃদয়ে, প্রবলের বিশাল বক্ষে—তরুতলে, পর্ণকুটীরে, অট্টালিকায় বেলভিডিয়ারে—বায়না কোথায় নাই? বড় লাটের বায়না শৈলাবাস, ছোটর বায়না 'জুরী' নাশ।

তবে আমাদের কাননিকার বায়না থাকিবে না কেন?

বয়সের সঙ্গে কাননিকার বায়নার পরিসর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিল যে, সকলে ঐকমত্যে বালিকার বায়নাবিকারের প্রতিকার-নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। যে সকল চিকিৎসক বীজাণু সকল রোগের কারণ বলিয়া, মাথাধরা হইতে কলেরা পর্য্যন্ত টীকা দিয়া আরোগ্য করিতে চান, তাঁহারা কোন বায়নাবীরের দেহরক্তে বালিকার টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বা চৌম্বকে, কেহ বা তাড়িতে বালিকার বায়নাকীট ধ্বংস করিতে চাহিলেন। এ সকল প্রতিকার-পরীক্ষা করা হইয়াছিল কি না, ইতিহাস বলে না; তবে কবিতার যে জয় হইয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

এক দিন মাতামহের হাত ধরিয়া, গৃহসন্নিহিত প্রান্তরে পরিক্রমনিরতা কাননিকা একটি বল্গাযুক্ত, নৃত্যশীল, সুন্দর ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইল। বালিকাকে ভুলাইবার জন্য চারিদিক হইতে লোক জুটিল। বালিকা ভুলিল না। মাতামহ বড় ফাঁফরে পড়িলেন। কোলে করিয়া নাচাইলেন, অকৃত্রিম ক্রোধ করিলেন। আহা! আহা! বালিকার কোমল অঙ্গে কঠিন করের প্রহার করিলেন। বালিকা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। ক্ষুদ্র তনুধনুখানিতে কথায় কথায় টঙ্কার দিল। তখন মাতামহ অপ্রস্তুত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মুখে চাদর জড়াইয়া ঘোড়া হইলেন। নাতিনীর হাতে চাদর দিলেন। নাতিনী চোখে ঠুলি-দেওয়া বেটো ঘোড়ায় চড়িল না। উপায়? তবে কি এই বায়না তরঙ্গিণী বাধাবিপত্তি না মানিয়া, সকলের আশা ভরসা মাথায় লইয়া অকূলে যাইয়া মিশিবে? তাহা হইলে যে সৃষ্টি যায়!

ক্ষুদ্র জল-স্রোত জলে মিশায়। কূলনাশিনী কল্লোলিনীর

মুখেই বদ্বীপ হইয়া থাকে। সেই বদ্বীপই আবার ফলে ফুলে শোভা পায়। সেথায় কুল্লাঙ্গী প্রিয়ঙ্গুলতা অশোক বেষ্টনে আকাশে উঠে; প্রান্তরচারী সমীরণ অঙ্গে বুক দিয়া লুব্ধ ভ্রমর ফলে ফুলে মধু লুটে। সেথায় সকল ভাবের ব্যতিক্রম। গৃহে গৃহে, পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুক্রম।

কাননিকার বাসনা-স্রোতোমুখে বদ্বীপ হইল। তাহাতে কবিতা কুসুম ফুটিল। দূরে প্রান্তর পারে আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া কে যেন গাহিল—"নড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে।" বালিকার ঘোড়া চড়িবার সাধ মিটিল। তখন সকলেই বুঝিল—কবিতা-রসই কাননিকার বাসনা জোঁকের চুন। সকলেই বুঝিল বালিকা রসিকা হইতেছে।

উপক্রমণিকা।

কাননিকার মাতামহ নিরঞ্জন সেন, শ্বশুর বিশ্বপাবন রায় কর্তৃক পদ্মানদীর তীর হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, গৃহজামাতা পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনিও শ্বশুরের দেখাদেখি, কিন্তু তাঁহাকে ডিঙাইয়া, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বায়না দিয়া তিনটী জামাতা শার্দ্দূল ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, দ্বিতীয়টী মেঘনার ধারে, তৃতীয়টি ধলনার চরে। আমাদের কাননিকা, নিরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা ভামিনীমণির স্ত্রীধন,—রমণীচরণ কাস্তগিরের একমাত্র সম্বল। নিরঞ্জনের গৃহ রমণী-তন্ত্র সংসার-রাজত্ব। কন্যার কন্যা তস্যা কন্যা এইরূপ কন্যা-ললামে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। জামাতা, প্রজামাতা, অতিবৃদ্ধ ততোধিক এইরূপ জামাতাবলী লইয়া তাঁহার সংসার। আগমে জামাতা নিগমে জামাতা। উছট খাইলে জামাতার ঘাড়ে পড়িতে হয়। পড়িয়া গেলে জামাতা যষ্টিতে ভর করিয়া উঠিতে হয়। এক কথায় জামাতার জামাতায় ধূল পরিমাণ।

কিন্তু নিরঞ্জনের গৃহ রমণীসঙ্কুল হইল কেন? কন্যার বিবাহ হইলেই ত সে শ্বশুরগৃহে যায়। নিরঞ্জনের গৃহের জলস্রোত পাহাড়ে উঠিল কেন? সে কথা বলিতে পুঁথি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কাননিকা কাব্য-পলায়ে, নিরঞ্জনের সংসার কথা যে জাফরাণ! কাজেই অগ্রে পলায়ের প্রধান উপকরণ মশলা পিষিতে হইল।

কাব্যময়ী কাননিকার অনন্ত লীলা। দুই চারি স্তবকে লীলা সাঙ্গ হয় কি? পাঠক, বোধ হয়, ইহাতেই বিরক্ত। কাননিকার

কাব্য কথা, কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সহিত বাসনা-বিবর্দ্ধনের কথা চলে চলে বর্ণে বর্ণে রসপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সে রসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত লীলা-ললিত কাননবালার কথা শ্রবণে ধৈর্য্য চাই। পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। সেলি কিটের আবেশময় কল্পনা-কক্ষে যে তৃপ্তি না পাইয়াছেন, ব্রাউনিঙ্গের ভাবসাগরে ঝাঁপ দিয়া যে রত্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছেন, পাঠক, কাননিকার কাব্য কথায় আপনার সে তৃপ্তির সাধ ঘুচিবে; ততোধিকতর মূল্যবান রত্নের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই বলি, পাঠক ধৈর্য্য ধরুন। আর ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন উনবিংশ শতাব্দীর এক বৎসরের এক দিবসের এক সময় ভামিনীমণির সাত রাজার ধন রমণী চরণের শ্বশুর নয়ন রঞ্জন নিরঞ্জন কলিকাতায় পদার্পন করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, নাগরিক-মধুকরের রহস্য-দংশনভয়ে নিরঞ্জনের কথা-কমলিনী দিবসে ফুটিতে ফুটিতে ফুটিত না। যখন ধরণী, কুমারীকুলের পাটরাণী abbess ঠাকুরাণীর মত কোমল বক্ষের রসতরঙ্গ গোপন করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গ তিমির বসনাঞ্চলে আবৃত করিত; যখন চটের কলের শ্রবণভেদী কোলাহল, গৃহপ্রাচীরস্থ চটক কুলের তদ্বৎমধুর কলকল; দিবালোকে আঁধারদর্শী ক্রিয়াহীন, অন্নহীন, লম্বশাটপটাবৃত নব্যবঙ্গের হাহা—আর সমপ্রাণতায় দলে দলে সমাগত বায়সকুলের শ্রুতিমধুর খা খা, একত্র মিলিয়া, পেচকের কমকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত; সেই সময় সমীরণে সাঁতার দিতে দুই একটি কথা-কুসুম বাতায়ন ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিত।

ক্রমে স্বভাবে অভাব হইল। নিরঞ্জনের কণ্ঠ-মৃণালে কমল না ফুটিয়া টগর হাসিল। বঙ্গাদপি বঙ্গসন্তানের মুখে বাঙ্গালা

বাহির না হইয়া ইংরাজী ছুটিল; ত্রিভুবন চমকিত হইল। ডারউইনের প্রেতাত্মা এই আকস্মিক বিকাশের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তিন দিবস তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া বৃন্দাবনের তমাল-তরুবাসী রামানুচরগণের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, আফ্রিকার গরিলাবাসে ফিরিয়া গেলেন। প্রতিবেশীগণ অবাক হইয়া রহিল।

কারণ নির্দ্ধারণ আমি করিয়াছি। নানা কারণে নিরঞ্জন বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গনরকুলের উপর বিরক্ত। ভাষারাক্ষসী নিরঞ্জনের মাথা খাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতিকা বঙ্গভাষা পদ্মার পারে বলে 'লবণ', কলিকাতায় বলে 'নুন'। সেখানে বলে 'হৈত্যা', এখানে বলে 'খুন'। আর পাষণ্ড নর, ভাষার বিশ্বাসহননে দুঃখিত না হইয়া, নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া হাসিত। নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাঙ্গালা ভাষা আর মুখে আনিব না; বাঙ্গা-লীর মুখ আর চোখে দেখিব না। কিন্তু হায়! একি কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার প্রতিজ্ঞা,—"কাল মেঘ আর দেখব না, কাল চোখের তারা রাখব না সখি" যে, কথার অর্থ উলটাইয়া রাগের কথা প্রেমের অর্থ প্রকাশ করিবে! 'আমার কানাই ভাল' দৃষ্টিহীনতার পরিবর্ত্তে বলাই অগ্রজের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব বুঝাইবে! এ যে উনবিংশতি শতাব্দীর বঙ্গ যুবকের প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞা অটল। কলিকাতায় আসিয়া মাসৈকমধ্যে নিরঞ্জন মূক হইলেন। বৎসরৈক পরে চোখে চসমা দিয়া, বাটীর বাহিরে আসিয়া, ইংরেজিতে মুখ খুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নিরঞ্জন-মুখে ইংরাজী খই ফুটিতে লাগিল। কখন কখন বা ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ কোনও অকর্ম্ম করিলে মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আসল কথা নিরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিলেন। তবে এক দিন বিছার দংশনে 'বাবা গো' বলিয়াছিলেন, আর এক দিন সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া 'গেছিরে' বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আমরা বৈয়াকরণ ইহাকে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া থাকি।

নরের উপর দারুণ ঘৃণা, রমণীপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইল। প্রথমেই নিঃস্বার্থ প্রেমিক, নিজের ঘর আদর্শ করিবার জন্য গৃহিণীর করে পাঁচন বাড়ী দিয়া, আপনি ভেড়া হইতে চাহিলেন। বিশ্বপাবননন্দিনী সেকালের হিন্দুরমণী, স্বামীদত্ত সেই মহামূল্য ধন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু মুষল যখন জন্মিয়াছে, তখন কি অমনি অমনি মিলাইয়া যাইবে! যাদব পরিত্যক্ত মুষলকণায় শর গজাইয়াছিল। কালে মাতৃপরিত্যক্ত যষ্টি ভগ্নাংশ হইতে, নন্দিনী-ত্রয়-হৃদয়নন্দনে স্বাধীনতার চারা জন্মিল। কালে সেই কল্পবৃক্ষের একটিতে কাননিকা ফল ফলিল। শররূপী মুষল-যদুকুল ধ্বংস করিল, ফলরূপী মুষল কুলনাশন হইবে না কেন!

শ্বশুরের কল্যাণে নিরঞ্জন হাকিম হইয়াছিলেন। হাকিম হইয়া অলিগলি, বনবাদাড়, মাঠপাঁদাড় ঘুরিয়া আইনবাণে বঙ্গীয় মাংসাশী মেষগুলাকে তাঁহার জর্জ্জরিত করিবার প্রয়োজন হইত। নিরঞ্জন সেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর ইংরাজীভাষা শরাসনে জুড়িয়া ছুঁড়িতেন। বিচারাসনসন্নিবিষ্ট ভাষাকুসুমায়ুধের পঞ্চশরে এক সময় মৃত্যুঞ্জয়কে পর্য্যন্ত কাঁপিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী-নরকুল নাশ করিবার জন্য নিরঞ্জন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই সে রক্তবীজ বংশ ধ্বংস হইল না।

আত্মার দোহাই দিয়া অর্থলোভে ভায়া আমার দিন দিন

কত অকার্য্য করিলেন। মানীর মান, বংশের সম্ভ্রম, দুর্ব্বলের প্রাণ, অনাথের আশ্রয়, কুলবতীর লজ্জাধর্ম্ম, অপরাধী হইতে যত আঘাত না পাইয়াছিল—তাহা হইতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, আমাদিগের নিরঞ্জন হইতে। কিন্তু দুঃখিত হয় কে? তুমি না আমি? আমি ত চীন-জাপানের যুদ্ধ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছি। আত্মাভিমানে অন্ধ রাজার আজ্ঞায় কত নারী স্বামীহারা, কত পুত্র পিতৃহারা হইতেছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে। তুমি আমার মাথায় হাত দেওয়ার কথা শুনিয়া, চক্ষে বসনাঞ্চল দিয়াছ। তাতে কার কি?

"তথা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী।
গেলে কথা ক'বে না সে নব ভূপতি।
যাবি তোরা মানে মানে, ফিরে আসবি অপমানে,
আমরা শুনে মরব প্রাণে, তাতে শ্যামের কি ক্ষতি।

কি ক্ষতি? তুমি আমি কাঁদিয়া মরিলে নিরঞ্জনের কি ক্ষতি? কিন্তু এখন? এখনকার অবস্থা আর কি বলিব? কেবল যাহার উপর আরোহণ করিয়া কৃষককুপুত্রেরও মুখে তত্ত্ব-কথা বাহির হয়, সেই বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন—মাটীর ধন মাটীতে মিশিয়াছে। শার্দ্দূলীকৃত মূষিক আবার মূষিক হইয়াছে। সেই দরিদ্রদলন, প্রভুরঞ্জন নিরঞ্জন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যৌবনসুখস্মৃতি আকাশে আঁকিয়া, গৃহপর্য্যঙ্কে গা ঢালিয়া, পুলিসপ্রহরণ নিরঞ্জন এখন যষ্টিতে দণ্ড কল্পনা করিতেছেন। সকলই গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে পুনর্যৌবনলোলুপা মালিনী মাসীর কাষ্ঠহাসির মত, সেই হাকিমি আড়ার বেশটী; আর ভ্রূর তলায় ঠোঁটের ডগায় বিলাতী রঙ্গের রসটী।

সেই রসটী নিরঞ্জন গৃহে আনিয়া নাতিনীকুলের হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন। সেই রসরসিতা কাননিকা বদন কমলে প্রখর রবির কর ধরিলেন। বৃদ্ধা মাতামহী কাননিকার মুখভ্রমে সূর্য্য ধরিতে চলিয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

যেই দিন "বৃষ্টি প'ড়ে টাপুর টুপুর নদীতে বান আসিল", সেই দিন "রাইজাগো রাইজাগো" তারকামণ্ডলস্পর্শী মধুর শুক শারী বোলে, ভারতের রাধিকাকুলে কল কল কোলাহল উঠিল। সেই দিন বোম্বাই বাই 'পতিত স্বামী' পরিত্যাগ করিয়া, রমণীর কুল দুকুলে বাঁধিয়া, বদরিকাশ্রম খুলিল। সেই শুভ দিনে সেনগৃহ হইতে জামাতাকুল অকুলে যাইয়া ঝাঁপ খাইল; আর কবিতারসে আর্দ্র কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল।

কারিকা।

কাননিকা চতুর্দ্দশে পা দিল; কিন্তু তাহার দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ এই কয় বৎসর কোথায় গেল? সকলেই বলিবে প্রতিজীবনে যেমন বৎসরের পর বৎসর উড়িয়া যায়, ষোড়শের মোহিনী অশীতির প্রেতিনী হয়, বিলাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়, কাননিকারও তাহাই হইল। সূতিকা গৃহ হইতে একটি একটি করিয়া জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া কাননিকা, রৌদ্র শীত হিম বর্ষা, রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসনাদি—নানা বাধা বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরে উপনীত হইল। সূতিকা-সরসী পঙ্কজকলিকা কাননিকা ধীরে ধীরে পত্র প্রসারে বিদ্যালয়-গামিনী ফুল্ল কমলিনী বিদুষী রমণী হইল। সকলেই মনে করিয়াছ কাননিকার মাতামহকে একটি একটি করিয়া বৎসর গণনা করিতে হইয়াছে। ভাবুক পাঠক তাহা হয় নাই। পাঠকের আজ্ঞানুবর্ত্তী বয়োবর্দ্ধন হইলে, নায়ক নায়িকা লইয়া আর আদর আবদার চলে না, কাব্য মহাকাব্য লেখা হয় না। দশম বর্ষে পা দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা কাননিকা এক দিন থামিয়া গেল। তাহার পর তিন তিন খানা বড় বড় নূতন পঞ্জিকার সৃষ্টি হইল, পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ ঘটিল, দশটা অকলঙ্ক শশি রাহুগ্রাসে পড়িল, তবু কাননিকার বয়োবৃদ্ধি হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কত ভাবুকের চুল পাকিয়া গেল, তবু কাননিকার বয়সের এক চুলও তফাৎ হইল না। লোবোর ব্যাণ্ড কত পথ, কত গলি, কত ঘুঁজি ঘুরিল, তবু কাননিকার কচ্চা কাল

এক ইঞ্চিও সরিল না। কি হইল,—এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেন হইল? সরিল না। কালের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল! যে—

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়
শোভাধার পূর্ণশশি রাহুগ্রস্ত হয়,—"

সেই কাল 'আজ'ই রহিয়া গেল! ভূত না হয় ছাড়িয়াই গিয়াছে, ভবিষ্যৎ গেল কোথায়?—কাজেই আমাকে কারিকা করিতে হইল।

কাননিকা যে দিন দশের মধ্যে পড়িলেন, সেই দিন জামাতা রমণীচরণ ও শ্বশুর নিরঞ্জনে বিবাদ বাঁধিয়া গেল। জামাতা বলিলেন, 'কাননিকার কন্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহ দিব।'

শ্বশুর বলিলেন, 'বালিকা বিদ্যাভাস করিতেছে, সুতরাং কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না, বিবাহ দিব না।'

জামাতা। আমার দেশে মান সম্ভ্রম আছে, পিতা আছে, সমাজ আছে,—নিন্দা হইবে। কন্যার বিবাহ না দিলে মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই ইচ্ছা করিতেছি কন্যার বিবাহ দিব।

শ্বশুর। তোমার মুখ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া খলনার তীর হইতে আনি নাই, অসূর্য্যম্পশ্য করিব বলিয়া ঘরে পুরিয়াছি। কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, বিবাহ দিব না।

জামাতা। আমার পিতা বড় দুঃখ করিবেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, বহু দিন পিতার মর্য্যাদা রাখি নাই, আজ রাখিব। শাস্ত্র মতে কন্যাকালে কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করিব, অরক্ষণীয়া করিব না।

শ্বশুর। যে দশম বর্ষীয়া শিশুকে বিবাহ করিতে পারে, সে

কখনই সৎ হইতে পারে না, সে পামর নরাধম পশু। আমি সেই পশুর হস্তে কাননিকাকে সমর্পণ করিব?—কখনই করিব না। মূর্খ! আমার আদরের নাতিনী অরক্ষণীয়া হইবে? আমি নিজে রক্ষা করিব,—যাবজ্জীবন বাঁচিয়া থাকিব, তাহাকে রক্ষা করিব।

কথা কহিতে কহিতে দুই পাঁচ কথার সহায়তায় বিবাদ-সমীরণ প্রভঞ্জন মূর্ত্তি ধারণ করিল। চারি দিক হইতে নিরঞ্জনের কন্যা, নাতিনী, প্রণাতিনীগণ ব্যাপার কি দেখিতে ঝড়ে পড়িয়া উড়িয়া আসিল। নরোত্তম দূর হইতে দেখিলেন যেন বিরাটের গোগৃহ অধিকার কালে, গোধন পরিবেষ্টিত ভীষ্ম-বৃহন্নলার লড়াই বাঁধিয়াছে। কিন্তু মৎস্য দেশের বৃহন্নলা গঙ্গানন্দনকে পরাভূত করিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের বৃহন্নলা শ্বশ্রু-মোহনের তীব্র বচনে গায়ের জ্বালায় মৎস্য দেশে ঝাঁপ দিল। নরোত্তম চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিলেন, প্রাণান্তেও আর কাহাকে উপমায় ফেলিব না।

জামাতা ভূমে করাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যা, আমি তাহার যথাসময়ে বিবাহ দিবই দিব।'

শ্বশুর জামাতৃকরাহত ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিল, 'আমার কন্যার কন্যা। আজীবন তোর সহিত আমার ক্রোধতরঙ্গিণীর প্রবাহ চলিবে, তথাপি কাননিকার বিবাহ চলিবে না।'

আমার জন্মদাতা পিতা, যাঁহার তুল্য বড় আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহার কথা না রাখিয়া আপনার কথা রাখিতে হইবে? জামাতা এই কথা বলিয়া একবার নবাগতা ভামিনী মণির মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন প্রাণাধিকা ভামিনীর মুখখানা যেন হাঁড়ীর মতন হইয়াছে দেখিলেন পদ্মপলাশলোচনস্থ ভ্রমর দুটা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। রমণীচরণ হতভম্ব হইয়া ফেলফেল

করিয়া সেই কি জানি কেমন কেমন মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন দেখিল, পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয় তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "কি বলিলি রে পাষণ্ড—অকৃতজ্ঞ নরাধম, উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশ্বজনীন প্রেম কাঠগড়ায় তোরে আসামী করিয়াছিলাম। বিনা জামিনে তোরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে শেষে এই শুনিতে হইল! তোর বাবা আমা হইতে বড় হইল! তুই কোথাকার কে? ধলনাতীরের বানর, তোরে আমি কলিকাতায় আনিয়া আমার নয়নমণি ভামিনীকে সমর্পণ করিলাম, একবার তোর পাত্রত্বের কথা ভাবিলাম না। সেই আমা হইতে তোর বাপ বড় হইল! ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি, কীটানুকীট আমি তোরে কন্যা সমর্পণ করিলাম, তোর বড়র বড় বাপ তোরে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল না? তবে ধলনা পারাইয়া, ত্রিস্রোতা ছাড়াইয়া, পদ্মা ডিঙ্গাইয়া এত দূরে আসিলি কেন?"

জামাতা অপমানিত বোধ করিয়া, রোষকষায়িত লোচনে একবার শ্বশুরের মুখ পানে চাহিল, শ্বশুরও চসমাবিদ্রাবী প্রখর দৃষ্টিতে জামাতার মুখ পানে চাহিল। কন্যাকুঞ্জরাগণ মদস্রাবী বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার রমণীচরণের শ্বশুরের মুখে চাহিল, আর বার নিরঞ্জনের জামাতার মুখে চাহিল। তার পর চারি দিকে কন্যাকুলের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও ঘন ঘন পাখা চলিতে লাগিল। বইয়ের তাড়া হাতে করিয়া স্কুল হইতে কাননিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর জামাইকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। কাননিকা দেখিল, যেন অগ্নিতোৎপলে এবং শ্বেত শতদলে সংক্রমণ হয় হয় হইয়াছে। শ্বশুরের ধূসর

কেশরাশি, জামাতার নিবিড় কৃষ্ণ কেশদামে জড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। কাননিকা দেখিয়া থাকিতে পারিল না, কিন্তু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!"

অমনি সম্মুখস্থ বাতায়ন-সমীরণ ভেদ করিয়া কোন দূরস্থ প্রাচীর হইতে প্রতিধ্বনি আসিল,

সু দয়রে!

কাঁদাইতে বারে বারে এ বিবাদ ঘরে ঘরে
যেখানে কাননি চরে আর কেন রয় রে!

চমকিত নিরঞ্জন জামাতার চুল ছাড়িয়া দিল, পরাভূত রমণী-চরণ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়চকিতা ভামিনী কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল, ভীতা ভগিনীকুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া বসিয়া পড়িল। বিমোহিতা কাননিকা কুরঙ্গিণীর মত চারি ধারে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। সকলে আবার শুনিল,

একি লো একি লো একি কি দেখি লো
এ চায় উহার পানে।
কেঁদে কেঁদে হাসে চুপ করে ভাষে।
বধির করিল কাণে।

সকলে লজ্জায় বসিয়া পড়িল।

তার পর কি হইল, কেহই বড় ভাল বুঝিতে পারিল না। শ্রোতা কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দর্শক হাঁ করিয়া চাহিল, লেখক কলম কাণে গুঁজিল, পাঠক বালিশে ঠেশ দিল, নরোত্তম খানিকটা আফিম গালে দিয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া শুনিল, কাননিকা

মাতামহের অপর আদেশ (until further orders) ব্যতীত, আর দশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতিবেশিগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অরুণ দেব তাহাদের বেয়াদবী দেখিয়া চোখ রাঙাইয়া উদয়াচলের উপর উঠিয়া বসিল। ভয়ে আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাঠিকা।

অবতারে কি কখন লেখাপড়া শিখিয়া থাকে! ভগবানের ভক্ত-গুলাকেই ত লেখা পড়া শিখাইতে কত মারামারি কাটাকাটি করিতে হইয়াছিল। ভক্তকুলচূড়ামণি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ 'ক' নাম শ্রবণ মাত্রেই কাঁদিয়া ভুবন ভাসাইয়াছিল। সুনীতি-নন্দন আজীবন বনে বনে ঘুরিল, তাহাকে 'ক' শিখাইল কে? জড়-ভরত 'ক' কহিবার ভয়ে কথা কহিত না। অবতার কি মানুষের কাছে শিখিতে চায়? মীন বরাহ কূর্ম্মকে দশ বৎসর ধরিয়া অঙ্কুশ প্রহার করিলেও কি তাহারা 'ক' বলিত? নৃসিংহ স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে লড়াই লাগা-ইয়া দিল, কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। বামন বলিকে ছলিবার জন্য সকাল সকাল উপনয়ন-সংস্কার সারিয়া লইল, বাড়ি-তেই পাইল না। ভৃগুনন্দন গোঁয়ার-গোবিন্দ, পরশু প্রহারে গর্ভধারিণীকেই শমন-সদনবাসিনী করিল, বাগ্বাদিনী এমন কি সাহসিনী ভৃগু মুনির পাড়ায় আসিয়া পা বাড়ায়? শিশুবোধ হইতে প্রমাণ পাই, কৃষ্ণচন্দ্র একবার পাঠশালে গিয়াছিলেন। ননী চুরীর নজীর হইতেও আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল, প্রমাণ কই? মহা-জনো যেন গতঃ স পন্থা। নন্দ-নন্দন পাচনবাড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিলে দেশ হইতে ছানা মাখমের পাট উঠিয়া যাইত। আর বল-দেব যদি লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে বলদেও হাম্বারব ছাড়িয়া পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিত। বাকী রহিল রাম আর

বুদ্ধ। কল্কির কথা ছাড়িয়া দাও, মাতৃভাষার যেরূপ দুরবস্থা, যখন কল্কি অবতার হইবে তখন কি আর দেশে ভাষা থাকিবে! রাম বুদ্ধ রাজার সন্তান, তাহাদের বিদ্যার্জ্জন বড় একটা অসম্ভব নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কি রাম স্ত্রৈণ পিতার এক কথায় রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়? লেখাপড়া শিখিলে, অন্ততঃ তাহার মনে এ তর্কও ত উঠিতে পারিত, 'এ সংসারে কে কার—কে কার পিতা কে কার পুত্র, কে কার গুরু কে কার শিষ্য—অনিত্য অনিত্য অনিত্য—এই দেহ অনিত্য, এই দেহ যার দেহাংশ-সম্ভূত, সেও অনিত্য, সুতরাং তাহার আদেশ অনিত্যের অনিত্য।'

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।

তবে আমি সেই অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিনাপরাধে পুত্রকে বন্ধ করিতে কৃতসংকল্প পিতাকে অপদস্থ না করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, কিম্বা অন্য কোন শাস্তি না দিয়া, শুদ্ধ মাত্র যে অমান্য করিলাম, এই যথেষ্ট। তবে যাও রামচন্দ্র তোমারও বিদ্যা বুঝা গিয়াছে। মূর্খ! কার কথায় তুমি কোথায় গেলে? সে তাহার প্রিয়তমার মন যোগাইতে তোমাকে বনে দিল, তুমি কেন তোমার প্রিয়তমার মন রাখিতে ঘরে রহিলে না? তোমারই মূর্খতার ফলে তুমি সীতাহারা, বানরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এই সভ্যজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে পাইলে ডুডুঙ্গে ঠুকিয়া দিত। তুমি মহিলার মর্য্যাদা রাখিতে জান না। নরোত্তম শর্ম্মা গৃহিণীর জন্য কত পাঠকের গাল খাইল, মান সম্ভ্রম সব খোয়াইল। সে তাহার জন্য পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, আর তুমি প্রজারঞ্জনের জন্য পত্নী ত্যাগ করিলে?

তুমি অজের পৌত্র অজমূর্খ,—হস্তীমূর্খ। তোমার বংশে কখন সরস্বতীর চাষ হয় নাই। আর সেই কপিলাবস্তুর অকাল-কুষ্মাণ্ড, সোপাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ? সেটা ছাগাদি হীন জন্তুর দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বামিগতপ্রাণা সদ্যঃপ্রসূতা স্ত্রীকে দুঃখসাগরে ভাসাইল। নিরামিষ খাওয়াইয়া নরোত্তমের চেলাগণের প্রাণযাত্রা থিয়েটারে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। মূর্খ, অবতার মাত্রেই মূর্খ।

বহু দিনের কথা, কাননিকার হাতে তুলি ও পেনসিল হইয়াছিল। তাহার সাহায্যে ও শিক্ষকের উপদেশে কাননিকা কত বন উপবন, লতা পাতা, দিঘী সরোবর, এমন কি চতুর্দ্দশ ভুবনই আঁকিয়াছিল। কাগজে কত লোকের মুণ্ডপাত করিয়াছিল, কিন্তু এযাবৎ 'ক' লিখে নাই। তবে কি কাননিকা অন্যান্য অবতারের ন্যায় মূর্খ হইবে?

আমরা ভ্রমাত্মক মানব, আমরা অবতারের লীলার মর্ম্ম কি বুঝিব? বহু দিন ধরিয়া কাননিকার 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কালে সেই কাননিকাই পণ্ডিতাগ্রগণ্যা হইল। 'ক'য়ের সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে নরোত্তমের সাত দিন নেশা ছুটিয়া গেল। অষ্টম দিনের গভীর নিশীথে শর্ম্মা দেখিলেন, দাদা মহাশয়ই বালিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবার অন্তরায়।

এক দিন ভামিনীমণি টক টক করিয়া চলিয়া আসিয়া চুরুটবদন বহির্গমনোন্মুখ নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কোথায় ভামিনী?"

ভামিনী। এই আপনারই কাছে। আপনি কি কাননিকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন? কাননিকা 'ক' বলিতে চায় না, উপায় কি?

নিরঞ্জন। 'ক' বলিতে চায় না! বলিস্ কি ভামু, কাননি সেই অসভ্যের ভাষার আগুক্ষর মুখে তুলিতে চায় না! ভামিনী, কাননি আমাদের ছলিতে আসিয়াছে। হে মহান্ প্রথম কারণ! যাহাকে অসভ্য পৌত্তলিকে ভগবান বলে, সভ্য মূর্খে ঈশ্বর বলে, সেই বিজ্ঞানবিনোদন, বৈজ্ঞানিকের আনন্দবর্দ্ধন, বস্তু ও গতির আদি কারণ মাধ্যাকর্ষণ! তুমি কেমিক্যাল কোহিসনে কাননির জীবন দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ। নহিলে আত্মারাম খাঁচা ছাড়িয়া ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া যাইবে। কাননি বাঁচিতে আইসে নাই। হে আমার প্রিয় ভামু! কাননি অন্তর্য্যামিনী, যত্নপূর্ব্বক কাননিকে রক্ষা কর। শরীর-রক্ষিণী হইয়া, নীরবে তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ কর। বাধা দিও না, তিরস্কার করিও না, পড়ার জন্য তাড়া করিও না।

নিরঞ্জনের বাকশক্তিতে ভামিনীমণির তাক্ লাগিয়া গেল। "বলিল, কি বাবা বাবু কাননি কি পড়িবে না?"

"না, পড়িবে না—যে ভাষার আগুক্ষর 'ক', যাহা কালিন্দী-কুলের কদাকার কদাচার কৃষ্ণের গোড়ায় আছে, যাহা অশ্লীলতা-ময়ী কালীর আবর্জ্জনাময় ঘাটের গোড়ায় আছে, যাহা কাঙ্গালী-বাঙ্গালীপূর্ণ কলিকাতার গোড়ায় আছে, এমন কি, কপালকুণ্ড-লার কাপালিকের আগাগোড়ায় আছে, সেই পাপীয়সী বঙ্গভাষা আমার প্রেয়সী নাতিনী কাননি পড়িবে?"

"—Stars hide your fires;
Let not night see my black and deep desires."

নিরঞ্জনের ভাবাবেশ হইল। পূর্ব্ব কালের সেই প্রতিবেশি-গণের তীব্র রহস্য একটি একটি করিয়া মনে পড়িল, মন তাহা

সহ্ করিতে পারিল না। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব লোপ, অথবা তাহার জোলাপ। নিরঞ্জন যেন দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রাণপ্রতিমা তনয়ানন্দিনী বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে একটি একটি করিয়া প্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া লইতেছে। বঙ্গভাষা মরণোন্মুখী, চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া দুর্ব্বল হইয়া এক্ষণে গোঁয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেবকগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—তখন মুক্তকণ্ঠে নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাননিকে যত্ন করিয়া কেবল বাঁচাইয়া রাখ, আদরে আদরে ফুলাইয়া তুল, রাগাইও না, কাঁদাইও না। কাননি 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' সব হইবে।"

তনয়ার সুখ্যাতি শুনিয়া ভামিনী আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি করিতে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। কেবল একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার অদৃষ্টে কাননি বাঁচিবে কি ?"

ঘরের বাহিরে হুঁক হুঁক শব্দ শ্রুত হইল। ভামিনী ছুটিয়া গেল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কোঁফুশ্যমানা কাননিকাকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, "এই দেখ কাননি আবার কিসের বায়না ধরিয়াছে।"

"কি হইয়াছে দিদিমণি !" বলিয়া দাদা মহাশয় ছুটিয়া গিয়া নাতিনীকে ভামিনীর কোল হইতে কাড়িয়া লইল, বালিকা দাদার কোলে তেউড়িয়া উঠিল। দাদা মহাশয় নাতিনীকে আদর করিতে করিতে কোলে করিয়া নিজে নাচিয়া কত নাচাইলেন, বালিকা প্রবোধ মানিল না।

তখন আবার ভামিনীর কোলে দিয়া নিরঞ্জন ডাকিলেন— "মাষ্টার !"

পক্বগুম্ফ মাষ্টার উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল।

নিরঞ্জন। তুমি কি বালিকাকে মারিয়াছ?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার এমন কি সাহস, আমি বালিকাকে প্রহার করি!

নিরঞ্জন। তবে কাঁদিতেছে কেন?

মাষ্টার নিরঞ্জনের মুখের ভাব দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নিরঞ্জনের মুখে শুধু বিভীষিকা দেখিল না। দেখিল, বিভীষিকার সঙ্গে সেই মুখে একটি পল্লীচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পল্লীতে এক সময় নিরঞ্জন হাকিমি করিয়াছিলেন। হাকিমি করিয়া বাঘে গরুতে জল খাওয়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ যখন তখন শুনিত, হাকিমের কাঠগড়ায় যে এক বার পা দিতেছে, সে আর ঘরে ফিরিতেছে না। কৌতুহলপরবশ হইয়া সে এক বার বহু দুরের গাছের আড়াল হইতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। দেখিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একটি বজ্র-হস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ধরিয়া কাটগড়ায় লইয়া তুলিল। চোরের মতন লুকাইয়া চারি ধারে চাহিবার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না বলিয়া, কাঠগড়া হইতে বৃদ্ধ কিছু দিনের জন্য কোথায় গিয়াছিল, অদ্যাবধি বৃদ্ধ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আজ বহুকাল পরে বৃদ্ধ দেখিল, সেই ভীম ভৈরব মূর্ত্তি। বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া এক বার ভগবানকে ডাকিল, "দয়াময়! আবার কি এক সপ্তাহের জন্য সেই অনিশ্চিত দেশে যাইতে হইবে?"

নিরঞ্জন তার ভগবদ্ভক্তিস্রোতে বাধা দিয়া, মাটিতে পা ঠুকিয়া হাকিমিরবে আবার বলিলেন—"তবে কাঁদিল কেন?"

সে স্বরতরঙ্গে পৃথিবীর কাক ছাতার গুলা পর্য্যন্ত নীরব হইয়া গেল!

নিরঞ্জন। শীঘ্র বল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হুজুর খাইবার জন্য।

নিরঞ্জন। খাইবার জন্য!—আমার নাতিনী কাঁদিতেছে খাইবার জন্য!

ভামিনী মাঝ খান হইতে একটা কথা কহিল।—আমার মেয়ে সোনার সামগ্রীও দিলে ফেলিয়া দেয়!—একি কথা মাষ্টার মহাশয়!

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি খাইবার জন্য?"

মাষ্টার দেখিল, সন্দেশ রসগোল্লাদি খাদ্যদ্রব্যের নাম করিলে ইহারা বিশ্বাস করিবে না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, "রিপুকর্ম্ম খাইবার জন্য।"

যেমন এই কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অমনি তাহা শুনিয়া কাননিকা বলিয়া উঠিল, "মা আমি রিপুকর্ম্ম খাব।"

তখন মাষ্টার দেখিল, ভগবান সকল বিপদের মূল এই সর্ব্বনেশে মেয়েটার মুখ দিয়াই অভয়-বাণী পাঠাইয়াছেন। তার সাহস ফিরিল। সেই সাহসে ভর করিয়া আবার বলিল, "আমি পড়াইতেছিলাম, আর ঘরের পাশ দিয়া এক রিপুকর্ম্ম যাইতেছিল। সেই রিপুকর্ম্ম কাননিকা খাইতে চাহিল।

নিরঞ্জন। তুমি বলিলে না কেন, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই।

মাষ্টার। হুজুর, আমি এক বার কেন, দুই বার, তিন বার, বার বার বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম খাইতে নাই, খাইলেই পেটের অসুখ হইবে।

ভামিনী। তুমি কেন বলিলে না রিপুকর্ম্ম পদার্থ নয়?

মাষ্টার। সে কথাও কি বলিতে ছাড়িয়াছি! আমি বলিয়াছি, রিপুকর্ম্ম চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদও নয়,—অপদার্থ। আমি বোধোদয়ের সমস্ত সূত্র গুলা একটি একটি করিয়া বুঝাইয়াছি।

নিরঞ্জন। তোমার মুণ্ড করিয়াছ। ফের যদি তুমি বালিকাকে পড়াইবার বেয়াদবী করিবে, তোমাকে পুলিসে দিব।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (মাষ্টারের দিকে ঝুঁকিয়া) চোপ্।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (লাঠি তুলিয়া) আবার—

মাষ্টার। আমার মাহিনা?

নিরঞ্জন। কৈ হ্যায়—

ভামিনী নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া ফেলিল, আর মাষ্টারকে বলিল, "পালাও, মাহিনার কথা আর মুখে আনিও না।" মাষ্টার ভামিনীর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিল, এক দৌড়ে ঘর হইতে পলাইল। আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

এ সংবাদ ঝড়ের আগে পাড়ায় আসিল। সকলেই শুনিল, নিরঞ্জনের বাড়ীর মাষ্টার পুলিসে যাইতে যাইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। মাষ্টারের দল ভয়ে আর নিরঞ্জনের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইত না। কাজেই নিরঞ্জনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, কাননিকার পাঠের কাল বায়নায় বায়নায় কাটিয়া গেল। কাননিকা বায়না ধরিলেই, সেই কোথাকার দূর হইতে সঙ্গীত উঠিত। যথা রিপুকর্ম্মের বায়নায়—

হায় রে রিপুকর্ম্ম
তোর এ কেমন ধর্ম্ম ?
নিত্য নিত্য ছেঁড়া দিস জোড়া,
তবে কেন এ সংসারে
মানুষের ঘরে ঘরে
শুকায়ে যায় রে ফুলের তোড়া ?
দেহ কাটে ষড়রিপু
তাতে ত চালাও রিপু
তবে কেন শিশু হয় বুড়া ?
হাসি কেন কান্না হয়
জয় কেন পরাজয়
আগা কেন হয়ে যায় গোড়া ?

দূরের সঙ্গীতের জ্বালায় অস্থির হইয়া নরোত্তম দিন কতক আফিম ছাড়িয়া দিল। কন্যার পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া নিরঞ্জন কাননিকাকে শেষে বিদ্যালয়ে পাঠাইল।

লোকশিক্ষার জন্য অবতারের জন্ম। অবতারের মনে যাহা আছে সে করিবে, মানুষে বাধা দিয়া তার কি করিতে পারে ? অথবা বাধা দিয়াই মানব বুঝি ধর্ম্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার করে ! প্যালিষ্টাইনের খৃষ্টীয়গণের উৎপীড়ন হইতেই রোম রাজ্যের পতনের সূত্রপাত, আর রোমরাজ্যের পতনের সঙ্গেই ইউরোপে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। মুসলমান সম্রাট আরঙ্গীব উৎপীড়নেই শিখ সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় হইবার সহায়তা করিয়াছিল। কাজীসাহেব হরিদাসের যেই পীড়ন করিল, বাইশ বাজারে কোড়া খাওয়াইল, অমনিই না বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল !

মাতামহ কাননিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবেন না স্থির করিলেন। কাননিকার মাষ্টারকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই জন্যই না কাননিকার আর মাষ্টার জুটিল না, আর সেই জন্যই না ভামিনী মণির মাষ্টারকুলের উপর অভিমান হইল, কাননিকাকে পড়াইবার জেদ হইল! আবার সেই জন্যই না কাননিকা স্কুলে পড়িতে চলিল! তবে সে স্থানে ইংরাজী পড়াটাই অধিক হইল, বাঙ্গালাটা লোক দেখান। তা যা হউক, একটা কিছু হইল ত! সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ম্লেচ্ছ শাস্ত্র, ওটা বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। সুতরাং কাননিকা অবতারন্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অর্থাৎ মূর্খা হইয়াও কার্য্যতঃ পণ্ডিত-কুল-ধুরন্ধরা হইলেন। কাননিকা এখন পাঠিকা, সুতরাং নয় বৎসর যাবৎ তাহার সহিত আর পাঠকের দেখা হইবে না। নরোত্তম এক বার দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু দরোয়ানের দুই কানমলা খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

প্রবেশিকা।

নয় বৎসর পরে ১৮—খৃঃ অব্দের বাসন্তী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এক পুস্তকালয়ের সম্মুখে একটা বৃষোৎসর্গ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে লোক ছুটিল, দেখিতে দেখিতে পথ লোকে পূরিয়া গেল। গাড়ী ঘোড়ার চলাচল বন্ধ হইল। নিকটস্থ অট্টালিকা সকলের সীমন্তিনীকুল ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিল। চারি দিকে কেবল "হৈ হৈ রৈ রৈ"—ব্যাপার কি! মানুষে ঘোড়ায় গরুতে গাধায়, স্থানটা দেখিতে দেখিতে যেন হরিহরছত্রের মেলা হইয়া পড়িল,—ব্যাপার কি! দেয়ালে ঠেশ দিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া যে সকল পুলিস-প্রহরী শান্তিরক্ষাকার্য্যের অশান্তির বিষয় চিন্তা করিতেছিল, শেষে তাহারাও আর স্থির থাকিতে পারিল না, চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল।—ব্যাপার কি? চারি দিকে কেবল মাররে ধররে কাটরে গেলরে গেছিরে শব্দ! আকাশে কড় কড় শব্দ; মাটীতে গাড়ী-গাড়ী-সংঘর্ষণে মড় মড় শব্দ; জনতার সীমান্তে প্রত্যাগমনোন্মুখ শকটচক্রের গড় গড় শব্দ; জনতাদর্শনে ভীতা, গৃহছাদগতা কোমলাকুলের হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে, হিষ্টিরিয়ার সঞ্চরণে, বমন বেগের হড় হড় শব্দ। কেবল ছিল না শিলাবৃষ্টির চড় চড় শব্দ। কিন্তু ছিল সমীরতাড়নে তরুপত্রের সর সর শব্দ, আর উন্মত্ত জীবগণের গমনাগমনে কম্পিতা ধরণীর পৃষ্ঠশোভাকরী অট্টালিকার স্খলিত বালিকামের ঝর ঝর শব্দ। কেবল শব্দ কেবল শব্দ!—ব্যাপার কি!

পৌরাণিক ভাবিল, বুঝি আবার সমুদ্র মন্থন হইয়াছে। সে অমৃত পাইবার আশায় চক্ষু মুদিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আধুনিক ভাবিল, বুঝি আবার পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছে। সে সিরাজুদ্দৌলার ধনাগারের টাকা আকাশে উড়িতে দেখিয়া ধরিবার জন্য লাফাইতে লাগিল। ভাটে স্থির করিল, শ্রাদ্ধ পাকিয়াছে। শকুনি স্থির করিল, মড়া পড়িয়াছে। কলিকালের পরশুরাম মনে করিল, বুঝি নারীর কথায় মাতৃহত্যা হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সংসার হইতে মাতৃকুলের উচ্ছেদ কর, কিম্বা আমহাউসে পাঠাইয়া দাও। বর্ত্তমানা নরমালাবিভূষণা, বিনিক্রান্তাসিপাশিনী কপালিনী ভাবিল, কোন রমণী বুঝি স্বামীর বুকে পা দিয়াছে। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল, গলার কাছে চাপিয়া ধর। অহিফেনসেবী ভাবিল, বুঝি আফিমের নিলাম হইয়াছে। সে দীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা কত দর?

ব্যাপার কি? ব্যাপার আর অন্য কিছুই নয়। তিন দিবস পূর্ব্বে কই বলিয়া একখানা বই বাহির হইয়াছিল। তাহার নয় শো নিরেনব্বই কপি দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে একখানি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই পুস্তক ক্রয় করিতে দুই জন লোক যুগপৎ পুস্তকবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হইল। দুই জনেই পুস্তকের জন্য লালায়িত, বিক্রেতা কাহাকে দিবে! সে অর্থলোভে পুস্তকের মূল্য দশগুণ চড়াইয়া দিল। এই স্থানেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, পুস্তক নিলামে চড়িল।

এক জন ক্রেতা বলিল—"ভাল আমি দশ টাকাই দিব।" অপর বলিল—"সে কি আমি থাকিতে তুমি এই পুস্তক লইবে? আমি দ্বিগুণ দশ টাকা মূল্য দিব।" এই বলিয়া ঝন ঝন করিয়া

কুড়িটা টাকা পুস্তকবিক্রেতার পাদমূলে ফেলিয়া দিল। পুস্তক-বিক্রেতা প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি ভাবিতে ভাবিতে যেমন সেই ক্রেতার পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিল, অমনি প্রথম ক্রেতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—"সে কি, এরই মধ্যে লইবে কি! এই লও পঁচিশ টাকার নোট।" ক্রেতা বিক্রেতার অপর হস্তে নোট দুই খানা গুঁজিয়া দিল। বিক্রেতা উভয় শঙ্কটে পড়িল, টাকা হইতেও হাত তুলিতে পারিল না, নোটের মুষ্টিও খুলিতে সাহস করিল না। বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিল, হায়রে প্রেস! তুই কেন এক হাজার একখানা পুস্তক প্রসব করিলি না। সগরমহিষী চক্ষের নিমিষে ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিয়াছে, আর তুই এক খানা বেশী প্রসব করিতে পারিলি না! বিক্রেতার বেশী ভাবা হইল না। দ্বিতীয় ক্রেতা একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট তাহার কানে গুঁজিয়া দিল।

১ম ক্রেতা। আমিও কি অমনি ছাড়িব? এই লও কর্ত্তা এক শো টাকা।

নোট বিক্রেতার মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইল।

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ শো!

১ম ক্রেতা। এই লও হাজার!

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ হাজার!

বিক্রেতার নাকে মুখে চোখে কাণে নোট প্রবেশ করিল। মাথায় রাশি রাশি নোটের আচ্ছাদন হইল। বিক্রেতা কালা হইল, কাণা হইল, দম আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। মাথায় নোটের ভার, গলায় নোটের হার, কপালে নোটের টিপ। বিক্রেতা জীবনে প্রথম বুঝিল, অর্থাগম সকল সময়ে সুখকর নয়।

চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবারে দম আটকাইয়া মরিরে! আমি পয়সা লইয়া পুস্তক বেচিব না।"

১ম ক্রেতা। ভাল, আমি তোমাকে ডিপ্লোমা দিব।

২য় ক্রেতা। আমি তোমাকে রায় বাহাদুর টাইটেল দিব।

১ম ক্রেতা। আমি তালুক দিব।

২য় ক্রেতা। আমি মুলুক দিব।

১ম ক্রেতা। আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দিব।

বিক্রেতা। আমার কিছু দিতে হবে না, আমায় ছেড়ে দেরে বাবারা! আমি একটু জল খাই।

ক্রেতৃদ্বয় বিক্রেতাকে ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। হোল্ড্-অপ-আরম্‌স, রাইট-টর্ণ, লেফ্‌ট-টর্ণ, স্লো-মার্চ, কুইক-মার্চ, ষ্টোকাটা মনিট্যাণ্টো—নানাবিধ সমরকৌশল প্রদর্শিত হইল। টানাটানিতে বই ছিঁড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে লোক জড় হইল। বিক্রেতা ভির্মি গেল। চারি দিক হইতে গ্রন্থকার আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

শেষে দর্শকগণের কিলোকিলি, দর্শিকাগণের চুলাচুলি, পুলিশের ঠেলাঠেলি। অহিফেনবাষ্পে যেন স্থানটা পূর্ণ হইয়াছিল, যে আসিল, সেই উন্মত্তবৎ আচরণ করিল। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে যার ঘরে গেল। কেবল কতকগুলি যুবক জনতাভঙ্গের পরও সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। সকলে এক একখানি ছিন্ন পুস্তিকার পত্র কুড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

একজন পড়িল—

বিবর নামেতে জন্তু অতি বলবান রে।
সর্ব্ব অঙ্গ আছে তার আছে দুটো কাণ রে॥

চলিতে হইলে সে যে পায়ে দেয় ভয় রে।
ঠক ঠক কাঁপে তার হয় যবে জ্বর রে॥
মরে গেলে মড়া মত নাহি নড়ে চড়ে রে।
এত দুঃখ তবু কিন্তু আছে সে ঝগড়েরে॥
হেসে হেসে কথা কয় তুমি ভাব গাধারে।
বিবরে খুঁজিতে পার কিছু নাহি বাধারে॥
তার মত বল দেখি আর কেবা আছে রে।
(হায় হায় এর পর পাতা ছিঁড়ে গেছে রে॥)

শেষোক্ত পংক্তিটি নরোত্তম শর্ম্মার রচিত। পত্রের শেষাংশ করাল কাল ছিঁড়িয়া লইয়াছে। সেই টুকু অন্বেষণ করিতে যুবক চারি ধারে চাহিল। জুতার তলায়, চোখের পাতায়, নাসিকার বিবরে, ওষ্ঠাধরে সর্ব্বত্র সন্ধান করিল, মিলিল না। পেনসিল দিয়া দশ হাত মাটিই খুঁড়িয়া ফেলিল, তবু সে ছিন্নাংশের সন্ধান হইল না। তখন বাহ্যজ্ঞানহীন, দশ দিক শূন্য দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিল। চৌরঙ্গী পৌঁছিতে দমদমায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পড়িল—

(তোটক)

লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পথে পথে।
বেলুনে দোলায় কাঁধে বাষ্পরথে॥
চলেছে অভাগা কত বুদ্ধিহীনে।
ভুবন আঁধার সেই এক বিনে॥
সে কোথা সে কোথা সে কোথা সে কোথা।
কাহারে বলিবে এ কথা এ কথা॥

(ছেঁড়া) ... জ্যোছনা ঝাড়িয়া।
(ছেঁড়া) ... ... লবরে কাড়িয়া॥
জীবনে তাহারে আদরে ধরিয়া।
মরমে মরমে যাবরে মরিয়া॥
সরস বসন্তে ... ... নিছনি।
(ছেঁড়া) ... ... কোথারে যাছনি॥

তার পর বরাবর ছেঁড়া। শেষাংশ পাইবার জন্ম হতভাগ্য মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি আরম্ভ করিল। চারি দিক হইতে কাগজের টুকরা জুড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায় জোড়াই সার হইল, তেলে-জলে মিশিল না। এ কবিতার টুকরা তার সঙ্গে; তার টুকরা এর সঙ্গে, থয়ে দয়ে দুধে ডালে, কটু তিক্ত কষায় অম্বলে, রৌদ্র বীভৎস করুণা আদি, ইত্যাদি বিসদৃশ রসের সংমিশ্রণে সে কেমন এক অখাদ্য খিচুড়ী হইয়া পড়িল। যথা—

নাচি বলে বলে ... ... কাঁদি দিবা নিশি।
দূর হয়ে যাও ... বঁধু ... আমি যে তোমায় ভালবাসি॥
মুকুতার পাঁতি যথা ... ... কাল কুচ কুচে
সূতিকা ঘরের শিশু ... ... চড়ে গাছে নাচে।
বার মাস পাইনি তোমা ... কজলী আব্‌
সখিরে সে কেন ... ... ঝিম ঝিম ঝিম।

পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নরোত্তম শর্ম্মা দুই এক স্থানে প্রক্ষেপ করিয়া দিল। নিরুপায়, নহিলে পাঠকপ্রবর যে দম আটকাইয়া মারা যায়! প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি কোটেশনে দিলাম।

উড়ে যায় 'হাস্তি' তার 'লম্বা দুটো ঠ্যাঙ্গ'
'মাকড়সার' জালে পড়ে 'চড়ক ড্যাড্যাঙ ড্যাঙ॥'

বন হতে এলো 'লজারু' আহা কি মূরতি চারু।
'ঘুঘু মারতে' ফাঁদ পেতেছি পড়ল কি না 'ব্যাঙ' ॥

নরোত্তমের কবিতারসে পাঠকের তৃষা মিটিল না। সে 'কই' 'কই' করিতে করিতে ছুটিল। এক জন লোক তাহাকে যশোরের দিক দেখাইয়া বলিল, "যশোরে যাও; সেখানে বড় বড় কই মিলিবে।"

কই যে কবিরাজের প্রিয় সামগ্রী!

তৃতীয় পড়িল।—

একদা প্রদোষকালে নিশীথসময়ে
জলদগর্জন ঘোর, শ্যামল প্রান্তর
নব জলধরে যেন পটলসংযোগ।
এমন সময় দীনা হেলেনা সুন্দরী
চারু মুখে মধু হাসি বিজরী ছাঁকিয়া
পূর্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, কোথা নাথ বলি
প্রবেশিল গভীর কাননে। কেহ সেথা
নাহি ছিল—ছিল শুধু তারা, আর ছিল
বন্যজন্তু জলজন্তু শার্দ্দূল কুম্ভীর,
মূষিক বিবরে, পক্ষী গাছের উপরে,
তরুতলে কাঠুরিয়া, কুঞ্জে মধুকর,
মধুলোভে অন্ধ ছুটি রাখাল বালক।
আর কেহ নাহি ছিল। সে নির্জন দেশে
হাজার হাজার নর ভ্রমিতে ভ্রমিতে
দেখিল, চলেছে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী।
তটিনীর বক্ষে এক তরণী সুন্দর,

হাল ধরে ছিল তার বসন্তকুমার।
ও পারেতে ছায়া-মাখা একখানি গ্রাম
নীরবতা কোলাহল মাখামাখি করে
গড়ায়ে পড়িতেছিল তটিনীর জলে।
সেই জলে হেলেনা ও বসন্তকুমার
এক সঙ্গে ডুব দিল, আর ভাসিল না।
হাতে হাতে ধরে দোঁহে জলের ভিতরে
করিল শোকের গান। অশ্রুবিন্দু দেখা
দিল হেলেনা-নয়নে, কাঁদিল আকাশে
শশী, কাঁদিল কানন, কাঁদিল জননী
কত পুত্রশোকাতুরা। বসন্তকুমার
গণ্ড ভাসাইল তার রোদনের জলে।
সহস্র সহস্র নর তীরে দাঁড়াইয়া
জাল ফেলে তুলে নিল প্রেমিকযুগলে।
কিন্তু হায় প্রাণশূন্য তারা যে এখন!
সমীর মলিনমুখে মধুর নিস্বনে
বলিল, কোথায় তুমি হেলেনা সুন্দরী?
কোকিলের কলকণ্ঠ জোরে ছিনাইয়া
বলিল হেলেনা, হায় মরে আছি আমি।
কোথা তুমি বসন্তকুমার! সুধামাখা
হাসিমুখে কেঁদে কেঁদে যুবা, উচ্চৈঃস্বরে
কবিরে ডাকিয়া বলে, "শুনহে সজ্জন!
যতন করিয়া কর আমার সন্ধান।"

পড়িতে পড়িতে পাঠকের পুলক, বেপথু, অশ্রুজল, একে

একে দেখা দিল। শেষে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া লোকটা তন্ময় হইয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে পুলীশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। দর্শক জিজ্ঞাসা করিল, "ধরিয়া লইয়া যাইতেছ কেন, লোকটা কি করিয়াছে?" পুলীশ বলিল, "কবিতারস বলিয়া কি একটা নূতন মদ উঠিয়াছে, এ লোকটা তাই খাইয়া মাতোয়ালা হইয়াছে। এই দেখ, লোকটার ঘাড় লটকাইয়া পড়িতেছে, পা টলিতেছে ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়াছে। এই দেখ, সাত ডাকে সাড়া দিতেছে না, এই দেখ, রুল মারিলেও সাড় হইতেছে না।" একজন যোগী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল। সে বলিল, "পাহারাওয়ালা সাহেব! লোকটার যে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!"

যে এত লোককে উন্মত্ত করিল, সে কবিটীকে জানিতে পারিয়াছ কি?

কার মনোমোহিনী পুস্তিকা তিন দিন আগে বাহির হইয়াছে? কে সেই ধন্য অথবা ধন্যা, নরের অগ্রগণ্য অথবা নারীর অগ্রগণ্যা? কে সেই মদনমোহন অথবা রতিমোহিনী, যে নীরব বংশীবাদনে গো-কুলে তুমুল ঝড় তুলিয়া দিল? তার জন্য রজকে কাচে না, দোকানী বেচে না, বালক নাচে না; তার জন্য গায়ক গায় না, পেটুক খায় না, ভিখারী চায় না; তার জন্য পাঠক পড়ে না, সাদী চড়ে না, ঘুড়ী ওড়ে না, এমন কি গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না; কে সে? এমন অসময়ে, দেশের এই দুর্দ্দিনে কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইল? যদি না জানিয়া থাক, পর দিনের সংবাদপত্র পাঠ কর। ওই দেখ কি লেখা রহিয়াছে!—

আজ ভারতের কি শুভদিন! যাহা বাঙ্গালী কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল। এবার হইতে গ্রন্থকর্ত্তাদের প্রেসের

দেনায় জেলে যাইবার ভয় ঘুচিয়াছে। বাঙ্গালী পড়িতে শিখিয়াছে। বাঙ্গালী মহিলার এক পুস্তক লইয়া বিশ সহস্র লোকে গত কল্য দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছে। দশ জন মরিয়াছে, পঞ্চাশ জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এক শত জন মরিব মরিব করিতেছে, বাকি মরে নাই, অবশিষ্ট বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের নাম 'কই'—কবি কাননিকা কান্তগির ইহার রচয়িত্রী। এই খানি তাঁহার প্রথম পুস্তক। এই সবে মাত্র তাঁর সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশিকা।

প্রহেলিকা।

শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া যে দিন রমণীচরণ আত্মনির্ব্বাসন দিল, যে দিন পতিবিয়োগিনী ভামিনী অঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া, কি হইল কি হইল স্মরিয়া, ত্রিতলে উঠিয়া, হারমোনিয়মের তিন গ্রাম সপ্তস্বরে সুর মিলাইয়া, চতুর্দ্দিকের নীল গগনে, কাল মেঘে, হরিপর্ণ তরুলতায়, ধবধবে অট্টালিকায় শোকসঙ্গীত ঢালিয়া দিল :—

কহ ত কহ ত সখি   বোল ত বোল ত রে
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
সোঙরি সোঙরি লেহ   এ তনু জরজর
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে ॥

আর ভগিনীও সঙ্গিনীগণের প্রবোধবচনে অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া—

বলয় করচূর   বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল   কি কাজ ভূষণে
যামুন সলিলে সব ডার রে ॥
সিঁথায় সিন্দুর   মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সহই না পার রে।
জ্যাকেট উপেখিয়া   গাউন পরিয়া
হইনু বাড়ীর বার রে।

বলিতে বলিতে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সখীসঙ্গিনী, কাননিকাকে লইয়া অন্যমনস্কা হইবার জন্য আলিপুরের পশু-

শালায় চলিয়া গেল। তার পর দিন জেদবশে কাননিকার বালিকাত্ব বজায় রাখিবার জন্য নিরঞ্জন গৃহরাজ্যের প্রজাগণের উপর এই আদেশ জারী করিলেন যে, কাননিকা আজি হইতে আর মাটীতে পা দিবে না। আদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাননিকা এর তার কোলে কোলেই বেড়াইয়াছিল; তবে মধ্যে মধ্যে সে সময় তার দুই এক দিন পদচারণও ছিল। একাদশ বৎসরের পর হইতে সেই দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কাননিকা ঘোড়ায় চড়িল, মাথায় উঠিল, পাল্কীর সাহায্যে আকাশেও উড়িল, কিন্তু এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ধরণীবক্ষ মাড়াইল না। যানাবস্থিতা কাননিকা মাতামহের আদরিণী, ঘোড়ার খঞ্জতায়, মাথার মত্ততায়, পাল্কীর চঞ্চলতায় এক দিনের এক দণ্ডের এক পলের জন্য আছাড়ও খাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে, গজস্কন্ধে কখন বা নরবাহনে বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিল, সেখানে বেঞ্চে বসিয়া রহিল, মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না।

মাতামহ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলেন,—কাননিকা কেবল ইংরাজী পড়িবে। দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা না হইয়া, হয় লাটিন, না হয় গ্রীক, না হয় জর্ম্মান্ ফ্রেঞ্চের মধ্যে যাহা হউক একটা, কিছুই না হয়, আরবী পারসী উর্দ্দু, এমন কি অসভ্য উড়িয়ার ভাষা হইবে, তথাপি বাঙ্গালা হইবে না। মাতামহের কঠোর আদেশে অভিমানিনী কাননিকা, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিল। বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিতে পারিল না, তাই উল্টা করিয়া কহিতে লাগিল। যথা, 'কি বল'র পরিবর্ত্তে 'ইক্ লব', 'আমি যাব'র স্থলে 'মিয়া আজব' ইত্যাদি। মাতামহের

কাছেই ওই রকমের কথা বলিত। এক দিন কাননিকা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া যেই কাষ্ঠসোপানে পা দিয়া টকাস করিয়া শব্দ করিল, অমনি নিরঞ্জন প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিলেন।

কাননিকার ফুল্লোৎপলসদৃশ মুখখানি সোপানারোহণ-পরিশ্রমে স্বেদনিষিক্ত হইয়াছিল। রক্তিম অধর দশনে চাপিয়া ভ্রূযুগলের কুঞ্চনে বালিকা শ্রমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া করকম্পনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল;—You are labouring under weakness I see.

কাননিকা। Speak in Bengali please, I don't understand your idiom.

নিরঞ্জন। তুমি দুর্ব্বলতার তলায় পড়িয়া পরিশ্রম করিতেছ, আমি দেখিতেছি।

কাননিকা। ইক লবলে? (১)

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন বুঝি শুনিতে পাই নাই। কাণ বাড়াইয়া বলিলেন,—"কি বলিলি?"

কাননিকা। ছিকু আন্। (২)

বিস্মিত নিরঞ্জন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এই বারে যেমন করিয়া হউক বুঝিব।—বলিলেন, "আবার বল্।"

কাননিকা। মুতি ঢুব্বা, মুতি ছিকু ঝুববে আন্। (৩)

নিরঞ্জন ভাবিলেন, কাননি বুঝি জাপানী শিখিতেছে।—

---

(১) কি বল্লে?

(২) কিছু না।

(৩) তুমি বুড়চা, তুমি কিছু বুঝবে না।

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"ভামু!"—"কেন গা" বলিয়াই ভামু নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন;—এই তোর জাপানী মেয়েকে ঘরে লইয়া যা।—কাননিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাঁধান দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিলেন;—"নাতনী, মিকাডোকে বে করিবি?"

কাননিকাও দাদার প্রত্যুত্তরে মুক্তাপাঁতি বাহির করিয়া বলিল,—"রুদ্ ঢ়ুবো।" (৪)

নিরঞ্জন। হাঁ কি না বল্, ও সব কাঁইচু মাইচু বুঝিতে পারি না। বে করিস ত বল, আমি তারে চিঠি লিখি। সেখানে জেডোয় রাজত্ব করিবি, মিয়াকোয় বেড়াইবি, হঙকঙে গান গাইবি, চুকিয়াংএ সাঁতার কাটিবি। আর লি হংচংএর সঙ্গে আলাপ করিবি।

কাননিকা মাতামহের কথায় আর কোন উত্তর দিল না, মাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোলে উঠিল, আর বলিল, "মা একটা হাম্।" মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিল, সকল লেঠা চুকিয়া গেল।

বেশ হইল, কাননিকা সব শিখিল; কিন্তু কবিতা লিখিল কে? যদি বাঙ্গালাই শিখিতে পাইল না, যদি আজীবন ইংরাজী লইয়াই কাননিকা দিন কাটাইল, তবে কেমন করিয়া কবি কাননিকা কান্তগিরের আবির্ভাব হইল! অথবা এ কি সেই কাননিকা? না কাননিকা একটা প্রহেলিকা?

কাননিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছে, নিরঞ্জন রিপোর্ট পড়িতেছেন। আজ মিল্টনের "স্বর্গবিচ্যুতি" গ্রন্থের শয়তানের সহিত কাননিকার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কাননিকার শয়তানচরিত্র বড়

(৪) ন্দুর বুড়ো।

মধুর লাগিয়াছে। বালিকা এক শয়তান সৃষ্টির জন্যই সেই অন্ধ কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। আর কেবল বলিতেছে, "হে শয়তান, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় কামনা করিতেছি, তুমি সেই বজ্রধারী ঈর্ষ্যাপরায়ণ যথেচ্ছাচার স্বর্গাধিপকে পরাভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।" আমরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, ও কথা বলিতে নাই, শয়তান জয়ী হইলে, পৃথিবীতে পাপের অবাধ প্রসার হইবে, দুই দিনের মধ্যেই পাপভারে পৃথিবী ডুবিয়া যাইবে। কাননিকা এ কথায় তুষ্ট হইল না, বলিল, "ডুবিয়া যাইবে কোথায়? আর যদিই ডুবিয়া যায়, আমরা সকলে জাহাজে করিয়া বেড়াইব!"—আমরা তর্কে তাহাকে হারাইতে পারিলাম না।

এমন বুদ্ধিমতী বালিকা পৃথিবীর আর কোন স্থানের কোন স্কুলে কোন কালে ভর্ত্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কাননিকাকে বাতাস খাইতে, হিম লাগাইতে, বেশী বেড়াইতে, কথা কহিতে, কিছুই করিতে দিবেন না। একটি গ্লাসকেশে পুরিয়া রাখিবেন।

আজ কাননিকা দান্তের প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিল, সেখানে প্রেতগণের সহিত কথা কহিতে তাহার কিছু আগ্রহ দেখিলাম। প্রেতপুরীতে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার কল্পনা কিছু ক্লিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বাড়ী যাইলে তাহাকে একটু বেশী করিয়া চা খাইতে দিবেন।

আজ কুমারী কাত্তগির কাউপারের 'সোফায়' চড়িল। সোফার জন্মকথা শুনিয়া কাননিকা একটু হাসিয়া বলিল, আগে-কার লোকগুলা এত মূর্খ, এই সোফা প্রস্তুত করিতে এত কাল কাটাইল! দু টাকার স্থানে দশ টাকা খরচ করিলে এক দিনের

মধ্যে শুধু সোকা কেন, কত কোচ, কত স্প্রীংএর গদী পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইয়া যায়। কাননিকাকে কি আপনি পূর্ব্বে সোফা পড়াইয়াছিলেন? সে এমন সুন্দর সমালোচনা শিখিল কোথায়?

আজ কান্তগির আর একটু হইলেই বিদ্যালয়ে হুলস্থূল বাঁধাইয়াছিল। টেম্পেষ্টের এরিয়েল চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এমনি তন্ময়ী হইয়াছিল যে, এরিয়েলের মত উড়িতে যাইয়া বেঞ্চ হইতে পড়িয়া পায়ে একটু আঘাত লাগাইয়াছে। অতি সামান্য, বাড়ী যাইতে যাইতে সারিয়া যাইবে, আপনি অনুভব করিতে পারিবেন না। কাননিকা রমণীরত্ন, আজ তাহাকে বাড়ীতে পড়িতে দিবেন না। বরং আপনার উদ্যান হইতে একটি আধ-ফুটন্ত 'প্যান্সী' তুলিয়া দিবেন।

আজ আপনার নাতিনী রাজকবি টেনিসনের কবি উপাধি কাড়িয়া লইয়াছে। টেনিসনের "সুন্দরী রমণীর স্বপ্ন" হইতে সকল বালিকাকে প্রশ্ন দিয়াছিলাম। সকলে প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল; কেবল ম্রিয়মাণা কাননিকা ডেবডেবে চক্ষু দুটিতে এক অঞ্জলি জল পূরিয়া, কপোলে করবিন্যাস করতঃ টেবিল-ছিদ্রস্থ একটি ছারপোকার চতুরতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমারী কান্তগির! তুমি কি আজ বাড়ীতে পড়িতে পার নাই?" উত্তর পাইলাম—"ইচ্ছা করিয়া পড়ি নাই। যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহার কবিতা পড়িতে অভিলাষিণী নহি। আর তাহাকে কবি বলিয়া কবি-নামের মর্য্যাদাও নষ্ট করিতে চাহি না। বঙ্গসুন্দরীর—শ্যামলতৃণক্ষেত্র-চারিণী, সরসীশোভিনী, বকুলতলবাসিনী, অন্তঃপুরবিলাসিনী, যেন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বঙ্গসীমন্তিনীর স্বপ্ন আগে তাহার দেখা

উচিত ছিল।” কাননিকা সুন্দরী; কাননিকা মৃদুহাসিনী, মধুরভাষিণী, গজগামিনী; কাননিকা আনন্দে উৎসাহে ভাষণে মৌনে অভিমানে, সর্ব্বদাই নেত্রে জল পূরিয়া রাখিয়াছে। তাহার টেনিসনের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার আছে। টেনিসনকে এ সম্বন্ধে এক খানা পত্র লিখিতে হইবে (১)। রাজকবি যদি প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে পরের মেলে তাহার কাছে লাইটব্রিগেডের চার্জ পাঠাইয়া দিব। দেখিব, টেনিসন কত শক্তিধর! কিন্তু কাননিকা!—ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে এত অনুভবশক্তি কোথা হইতে আসিল। টুলটুলে মুখখানিতে এত কথাকুসুমরাশি কেমন করিয়া ধরিল! কি কঠিনতা! বৃদ্ধ মরণোন্মুখ টেনিসনের একমাত্র আশ্রয়স্থল কবিপদ—তাই কি না অম্লানবদনে কাড়িয়া লইল! কি কোমলতা! বঙ্গনারীর জন্য অকাতরে প্রাণভাণ্ডারে রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস ও সাগরপ্রমাণ চক্ষুজল পুরিল!! কাননিকা নারীকোলরিজ আভ্যন্তরীণ কবি, কাব্যভরা প্রাণ—শত সেক্ষপীর, সহস্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, অযুত বায়রণ, লক্ষ শেলীর প্রতিভা লইয়া এই ক্ষুদ্র পাখীর প্রাণ রচিত হইয়াছে। সে প্রাণের মুখ ফুটাইতে ভাবার কথা নাই। কাজেই কবি নীরব—এ ফুল ফুটিতে ফুটিতে ফুটিবে না।

পেন্‌সনভোগী নিরঞ্জন, দিন দিন এই রকম রিপোর্টসুধা পান করিতে লাগিলেন, এবং ষাঁড়াষাঁড়ীর বাণের ন্যায় জ্যামিতিক বৃদ্ধিতে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ চক্ চক্, বুক ঠক্ ঠক্, জিহ্বা লক্ লক্ করিতে লাগিল। তাঁহার দাঁত কড় কড়, হাড় সড় সড়, গলা ঘড় ঘড়, প্রাণ ধড় ফড় করিতে লাগিল।

(১) হায়! টেনিসন আর ইহজগতে নাই।

তিনি থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, রে বঙ্গ, মূর্খ, অসভ্য সমাজ, সমাজকুলকলঙ্ক, তোর নির্ম্মম অঙ্কে আমি মিনার্ভার (২) অভিনয় দেখাইব। দেখাইয়া সমাজ আমেরিকার ওয়াশিংটন হইব।

এক দিন গৃহসংলগ্ন উদ্যানপ্রান্তরে কন্যাকুলপরিবেষ্টিত নিরঞ্জন টেনিস খেলিতেছিলেন। কাননিকা কিঞ্চিৎ অসুস্থা, একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ও একটি গোলাপ ফুলের বৃন্ত ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন। বকুল গাছের ফুল আপনা আপনি ঝরিতেছিল, ক্রোটনের পাতা আপনা-আপনি নড়িতেছিল, ফুলরেণু চারি ধারে উড়িতেছিল, টেনিস বল ব্যাট হইতে ব্যাটান্তরে যাইতেছিল, কখন বা জালে আবদ্ধ হইতেছিল, কখন মাটিতে গড়াগড়ি খাইতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে কপোত কপোতী উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের পাদমূলে পতিত হইল। সকলে চমকিত হইল, আর ঠিক সেই সময়ে বিস্ময়ান্বিতা কোন এক রমণীর করনিক্ষিপ্ত টেনিসবল, কপোতের ঘাড়ে পড়িয়া তার প্রাণ হরিল। সশব্দ পক্ষপুটে হৃদয়ের কাতরতা জানাইয়া কপোতী নিকটের উইলো তরু শিরে উঠিয়া বসিল। নির্ম্মম উইলো এমন অসময়ে তারে স্থান দিল না। শাখা নত করিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিল। রমণীকুলমধ্যে একটা দুঃখের হাসির বিভীষিকাময় শব্দ উঠিল। আর কাননিকা ইজিচেয়ারে আনমনে কি একটা হিজিবিজি লিখিল। চেয়ার পড়িয়া সেই কথা সকলকে শুনাইল :—

(২) মিনার্ভা—গ্রীকদিগের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আরে রে টেনিসবল কি কাজ করিলি রে
কপোতে বধিয়া!
আরে রে উইলো সখি, এ কি তোর কাজ দেখি!
কোমলা হইয়া
পতি-হারা কপোতীরে, দিলি কি না দূর করে!
গোরস্থানে তাই বুঝি থাকিস পড়িয়া?
টেনিসের বল সনে চলে যালো লণ্ডনে
যেথা হতে তো দুটোরে এনেছে ধরিয়া।
বঙ্গ তোরে নাহি চায়, যালো সেণ্টহেলেনায়,
অথবা চলিয়া যালো একেবারে কোরিয়া।

প্রজ্জলিত ধধুপ যেমন আকাশমার্গে হুস করিয়া উঠিয়া যায়, সনিরঞ্জনা যোষিদ্গণের প্রাণ তেমনি সেই কবিতানলস্পর্শে মুহূর্তমধ্যে অনন্তের দিকে ছুটিয়া গেল। কেরে!—এ প্রাণোন্মাদিনী কাব্যকথা কে কহিল রে! কঠিনার পাথর প্রাণ দ্রব কে করিল রে! বস্ এই পর্য্যন্ত। তার পর দীপনির্ব্বাণ,—যেন কোথাও কিছু হয় নাই। নিরঞ্জন ডাকিল, কাননিকে! ভামিনী বলিল, কাননি! মাতুস্বসৃগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, কানি! নিকুঞ্জ-বন প্রতিধ্বনি পাঠাইয়া তত্ত্ব লইল কানু! কই কোথায় কাননি?

সকলে দেখিল ইজিচেয়ার শুধু পড়িয়া আছে। নিরঞ্জন ভাবিল, এ কবিতা কি কাননিকার? অসম্ভব, অসম্ভব! কান-নিকা যে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানে না! সে যে বাঙ্গালা কহিবার ভয়ে জাপানী শিখিয়াছে! তবে কি ইজিচেয়ারে কবিতা আওড়াইল। দূর হক্, আর ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া এ প্রহেলিকার মীমাংসা হইবে না।

পরদিন প্রভাতে বিদ্যালয় হইতে রিপোর্ট আসিল। "সর্ব্বনাশ, কাননিকা আর পড়িতে চায় না। সে বলে 'যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ভুলিয়া যাইব। রসনামূলে ইচ্ছাপ্রহরিণীকে বসাইয়া রাখিব, সে আর একটিও ইংরাজী কথা মুখে আসিতে দিবে না। যাহা মূর্খে বলে, অসভ্য বর্ব্বরেও বলিতে পারে, এমন সর্ব্বজনবিদিত ইংরাজীও উচ্চারণ করিব না। সুধা-উত্তর, বেঙাচি, চেহারা, ট্যারামাই বলিব, তবু সোডাওয়াটার, বেঞ্চ, চেয়ার, ট্র্যামওয়ে বলিব না।'—কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই, অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি। বলে নাই, পড়ে নাই, একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে নাই। দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন পাষাণ-প্রতিমা।"

নিরঞ্জন তখন নারী কেন বিচার-পতী হইবে না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে কারণ নির্দ্দেশ করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে-ছিলেন। কাননিকার দুই দিন বাদে "বিয়ে এমেম্ব" শেষ হইয়া র‍্যাঙলারত্ব লাভ হইবে। তখন তাহাকে একটা আধটা হাকিমি না দিয়া কেমন করিয়া ঠাণ্ডা রাখিবেন, এই বিষয়ই ভাবিতে-ছিলেন। এমন সময় এই হৃদ্বিদারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়কবাট মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎ-পাতের পূর্ব্বক্ষণে যেমন পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম নির্গত হইয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, নিরঞ্জন সেইরূপ একটি বাহাদুর চুরটে গোটাকতক ফাঁকা টান টানিয়া ঘরটাকে অন্ধকার করিয়া ফেলি-লেন, তার পর একটা হুঙ্কার গর্জন। ভৃত্য কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিল। করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইল, কথা কহিল না।

দেখিল প্রভু ছড়ি লইতেছেন, লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। ঐ ছড়ি উঠিল, তাহার পৃষ্ঠে পড়িল, আবার উঠিল, আবার পড়িল। বারকতক তাহার পৃষ্ঠে উঠাপড়া করিল। সে কেবল নীরবে হাত বুলাইল, আর নিরঞ্জনের প্রহারাবশিষ্ট অঙ্গগুলা হাত বুলাইবার ছলে দেখাইয়া দিল। সেই গুলাতে আর প্রহার না করিয়া, নিরঞ্জন শুদ্ধমাত্র ক্রোধবিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"দিদিবাবু কোথা?" ভৃত্য বাঁচিল, ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যেই কাননিকাকে আনিয়া হাজির করিল। দেখ দেখ! আজ কাননিকা বিচার-মন্দিরে যেন গুরু অপরাধের আসামী। বৃদ্ধ চাকর যেন চাপরাশী। কাননিকাকে এক হস্তে ধরিয়া অন্য হস্ত নিরঞ্জনের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখ, তোমার জন্য প্রাতঃকালে আমাকে প্রহার খাইতে হইল। আমার হাত মুখ ঘাড় পিট টিট হইয়া গেল। আবার যে তুমি, "হায় রে নীল গগন, হায় রে নব ঘন!" করিবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া নৈমিষারণ্য দেখিবে, ইজি চেয়ারে বসিয়া সাগরতরঙ্গের ভ্রূভঙ্গে কম্পিতা হইবে, হাবুডুবু খাইবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ছবিতে আঁকা পাহাড়ে উঠিয়া, তাহা হইতে পড়িয়া পা ভাঙিবে, কস্তূরী হরিণ ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিবে, আর আমাদের কৈফিয়ত দেওয়াইতে দেওয়াইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে, সেটি কোন মতেই—আর হই—তে—ছে—না।"

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কি! ভৃত্য বেটা বলে কি! এ কি গাঁজা খাইয়াছে, অথবা কাননিকা কর্ম্মনাশানদীর জলে পা ঢালিয়াছে? ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। "চলিয়া"

বলিয়া “যা” বলিতে না বলিতে দেখিলেন, ভৃত্য নাই। তখন রুক্ষস্বরে কাননিকাকে কহিলেন,—“হাঁরে কাননি!”

কাননিকা উত্তর দিল না। অবনতমুখী নখ দিয়া কেবল গালিচা খুঁটিতে লাগিল। নখ পাদুকার ভিতরে ছিল। মাতামহ—মাতামহ কেন, নরোত্তম ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরঞ্জন আবার সুধাইলেন, “হাঁ কাননিকা!”

কাননিকার মস্তক কথাকর্ষণে আরও যেন নমিত হইয়া পড়িল। তখন নিরঞ্জন নিরুপায়, মৌনবতীর মুখ ফুটাইতে না পারিয়া হাত ধরিয়া সোহাগকম্পিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসিলেন, “প্রিয় কানু!” কানু ধেনীট্যাণ্ডরার মত তিড়বিড় করিয়া হাত টানিয়া বলিল, “যাও।”

নিরঞ্জন। কেন, তোর হইল কি?

কাননিকা। আমার কিছু হয় নাই।

নিরঞ্জন আর নাতিনীকে রহস্য করিলেন না। রিপোর্ট পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতেছিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোর নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। তা নহিলে কেন তুই বালসুলভ চাপল্য ছাড়িয়া প্রবীণার মত গম্ভীরা হইতেছিস্। আর তোর রহস্য ভাল লাগে না, পাঁচ জনের সহিত মিশিতে সাধ যায় না, পড়িতে রুচি হয় না!—ভাল কথা, ইংরাজী পড়িতে তোর আবার অনিচ্ছা জন্মিল কেন!”

কাননিকার মুখেও চঞ্চল হাসির পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের একটা স্থায়ী আবরণ আসিয়া পড়িল। মাতামহের কথার ভাবে বুঝিল, স্কুল হইতে রিপোর্ট আসিয়াছে।—জিজ্ঞাসা করিল, “রিপোর্ট পড়িয়াছ?”

নিরঞ্জন। তবে কি ভুতের কাছে শুনিলাম!

কাননিকা। যাহা শুনিয়াছ, সমুদায় সত্য; ইহার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি ইংরাজী পড়িব না। বল দেখি, 'ব্যাচিলরের' 'ফেমিনাইন' কি? 'মেড্' নয়? তবে পুরুষে যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্যাচিলর অব আর্টস্' হয়, নারী সে সময় 'মেড্ অব আর্টস্' হয় না কেন? অর্থাৎ পুরুষে যখন বি. এ. হইবে, স্ত্রীলোকে তখন এম্. এ. হয় না কেন? যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয়, সে ভাষা আমি আর পড়িব না।

কাননিকার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। মুখ হাঁ হইয়া গেল, বাঁধান দাঁত ঝরিয়া গেল, ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িল।

কাননিকা দাদার উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, চলিয়া গেল। রাশি রাশি সমীরণ কাননিকার ভয়ে দাদামহাশয়ের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল, যেই কাননিকা চক্ষের অন্তরাল হইল, অমনি হুস করিয়া পলাইয়া, মরুৎসখাগণকে সংবাদ দিল। সমীরণ রাত্রের ব্যাপার খানা কি, মীমাংসা করিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ করিল। পোর্টকমিশনরগণ বিপদনিশান উড়াইয়া দিল—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন চলিয়াছে।

নিরঞ্জনের হৃদয়ে কিন্তু আগুণ জ্বলিল। নিরঞ্জনকে ক্ষার করিবার জন্য সেই অনলকে দ্বিগুণ জ্বালাইতে চারি দিক হইতে ফূৎকার আসিল। ভামিনী আসিয়া বলিল;—"বাবাবাবু, সে দিনকার কবিতা কাননি করিয়াছে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখিয়া কে এক বাল্মীকি মুনি কবিতা আওড়াইয়াছিল; কাননীও কপোতের মৃত্যু দেখিয়া তাই করিয়াছে।"

নিরঞ্জন আর একটিও কথা কহিলেন না। কেবল হুম্-ম্ বলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভামিনী বাবা বাবুর ভাব দেখিয়া আর কিছু বলিল না। পা টিপিয়া পা টিপিয়া পলাইয়া গেল।

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত কাননিকা আর কোথাও শুনিয়া শিখিয়াছে। —নহে কি এই অসম্ভব ব্যাপার নাস্তিক নিরঞ্জন বিশ্বাস করিবে ?—"

বাতায়নপথে বেগে সমীরণ প্রবিষ্ট হইয়া বলিল "হাঁ হাঁ !" দেয়ালে টিকটিকি বলিল, "ঠিক ঠিক ?" পদঘর্ষণ-মুখরিতা গালিচা বলিল, "ইয়েস ইয়েস !"

কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিল, "তা নয়—এ যে প্রহেলিকা !" নিরঞ্জন হাই তুলিয়া তুড়ী দিলেন।

দূরে কে যেন গাহিল—

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার,
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার।
যখন পুরুষবর হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান।

নিরঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাননিকার অত্যধিক আদরে নিরঞ্জনের অপর কন্যাদ্বয়ের ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছিল, —পিতার মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া তাহারা সেই বৃদ্ধকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার এই এক উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। জ্যেষ্ঠা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—বাবা ! কাননিকা কি একটা স্বনিতা লিখিয়াছে। "বটে বটে" বলিয়াই নিরঞ্জন আর

না শুনিতে হয়, এই জন্য ঘর ছাড়িয়া বারাণ্ডায় আসিলেন। মধ্যমা কন্যা রায়বাঘিনীর মত বাপের সম্মুখে একখানা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন বহু দিন ধরিয়া পেনসন খাইতে দেখিয়া, কোম্পানী বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জীবন্তে গ্রাস করিবার জন্য তিন তিনটা মায়ারূপিণী 'হাঁ' পাঠাইয়া দিয়াছে, দুইটার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এটা বুঝি আর ছাড়িল না। থাইল, ওই ধরিল—নিরঞ্জন একেবারে সোপানে পা চাপাইয়া দিলেন।

"বাবা বাবু যাও কোথায়? কাননির একটা কবিতা শুনিয়া যাও।" "আসচি আসচি", বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে উঠানে।

কোথায় প্রাঙ্গণান্তরালে একটা নাতিনী দাঁড়াইয়াছিল, সেটা টপ করিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, তাহার হাতে কবিতা লেখা একখানা কাগজ।—"ওকি ওকি"—বলিয়াই হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চারি দিকে পথ দেখিতে লাগিলেন। বালিকা পড়িতে লাগিল :—

কি জানি কি সাধ নিয়ে কেন এ মরম সই
কেন মর্ম্মে বেদনার রাশি।
কেন ভালবাসা প্রাণে আকাশেতে চেয়ে রই,
কেন লো কাঁদিতে গিয়ে হাসি।

বেশ বেশ, বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে দরজায়। সেখানে দ্বারবানের স্কন্ধে জনৈকা নাতিনী বসিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই ঝাঁপাইয়া তার গলা ধরিল।—"কে তুই?—নিরঞ্জন আর দেখিতেও সাহস করিলেন না।

বালিকা বাহুমৃণালে দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া, কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল :—

আমি কে আমি কে ব'লে নিতুই সুধাও হায়
আমি কিগো নায়িকা চিন্তার ?
আমার হৃদয় কিগো তোমার হৃদয় নয়,
আমিই কি একা আপনার ?

মরীচিকা।

বাটীর বাহির হইয়া নিরঞ্জন ভাবিলেন,—"যাই, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরি। কি করিতে যাইলাম, কি হইল। সমস্ত কার্য্যই যদি পণ্ড হইল, কাননিকা ইংরাজীই যদি ছাড়িয়া দিল, তবে আর জীবনধারণে লাভ কি?" নিরঞ্জন সঙ্কল্প স্থির করিবার পূর্ব্বে শান্তির আশায় চারি ধারে চাহিলেন। শান্তি কই? আজ রবিকর এত প্রখর কেন, সমীরণে এত কাঠিন্য কেন? পথ ধূলিরূপে অনল-কণা গায়ে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রান্তরের শ্যামল তৃণরাজি, পাদুকা উপেক্ষা করিয়া সূচীর ন্যায় চরণে বিঁধিতেছে। আর ভাগীরথী!—তোর জল এমন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে কেন? অমন গরম জলে ডুবিয়া মরিলে যে গাত্রদাহ হইবে!

নিরঞ্জন ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর একটা সুগম পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে—

"————মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥

দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘেতে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥"

এ হেন অপরূপ রূপলাবণ্যময় যুবক রতন,
তার হাতে ছড়ি মুখে দাড়ী চোখে পরকোলা।
করে তুচ্ছ কেশগুচ্ছ ঘাড়ে পিঠে ফেলা॥
সব ছিল না কেবল সীমন্তে সিন্দুর।
দিল দেখা মেঘ-মাখা লাবণ্য ইন্দুর॥

সেই সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি হইতেও এককাটি বেশী সুন্দর যুবা, সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে নিরঞ্জনের দৃষ্টির ধারে পাদচারণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু হায়! পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে—পুরুষ? না, পুরুষ শুধু সৌন্দর্য্যের কথা লিখিতে পারে, দেখিতে পারে না। তবে তুমি যদি আকর্ণবিশ্রান্তবদনা, মৃগমুখী শশীচোখী কঠোর রসিকা বয়োধিকার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ কর, আর তার প্রেমে বিশ্ব সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, তাহা হইলে শুধু পুরুষ কেন, কাফ্রিনীর মুখেও তুমি হেলেনের হাসি দেখিতে পাও। এমন তোমাকে আমার দূর হইতে নমস্কার। পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে? নারী? না, অনৈকা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাভিজ্ঞা বিদুষী

বলিয়াছেন, "পুরুষের গুণই সুন্দর, সৌন্দর্য্য সুন্দর নয়। রমণীর চক্ষে সুন্দর পুরুষ হইতে সুন্দর নারী দেখায় ভাল।" পুরুষের রূপ দেখে শুধু উপন্যাসের নায়িকা। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, কেন না, নিরঞ্জন যুবকের রূপ দেখিলেন না। বহুক্ষণ ধরিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে আগন্তুক ঘুরিল, নিরঞ্জন ভাগীরথীর দিকেই চাহিয়া রহিলেন, একবারও মুখ ফিরাইলেন না। আগন্তুক গলা খাঁকারিল, লাঠি ঠুকিল, জুতা ঘষিল, চশমা খুলিল, আবার পরিল—নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ। তৎপথগামী দুই এক জন পথিককে চেনো চেনো করিয়া বার দুই হালু হালু (hallo) করিল, তথাপি নিরঞ্জন মর্ম্মর পাথর। তখন নিরুপায় হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নিরঞ্জনও ভাগিরথীর মধ্যে যে প্রাদেশ প্রমাণ স্থান ছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়কে কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি না ?"

নিরঞ্জন তথাপি যে নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন—একবার নড়িলেনও না চড়িলেনও না, জীবনের একটু চিহ্নও দেখাইলেন না। নিরঞ্জনের প্রাণ শান্তির আশায় ঝুরিতেছিল। কিন্তু হায়! কোথা হইতে এক নূতন অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন মনে মনে স্থির করিলেন যে, এ বর্ব্বরের সঙ্গে কোনও ক্রমে কথা কওয়া হইবে না। ও তোষামোদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিক,—"কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি, কেমন আছেন, বাড়ীর সংবাদ ভাল",—ইত্যাদি যা মনে আসে বলুক, আমি কথা কহিব না।—ও বলুক "আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভক্তি আসিয়াছে, আপনার তুল্য মহৎ জগতে আর নাই, আপনি ডেপুটীকুলচূড়ামণি, আপনি ধর্ম্মাবতার"—আমি কথা কহিব না। ও

বলুক, "আপনিই কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে পূরা পেন্‌সন পাইয়াছেন, আপনার অবসর গ্রহণের পর হইতে দেশে চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে, গ্রামবাসিগণ আবার মাথা তুলিয়াছে"—আমি কথা কহিব না।

নিরঞ্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যুবকও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অথবা তার অভ্যন্তরে এমন কোন শক্তি সঞ্চারিতা যে, বৃদ্ধের সহিত দুই একটা কথা না কহাইয়া তাহাকে নড়ায় কার সাধ্য? নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকও ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। নিরঞ্জন আবার ফিরিলেন, যুবকও আবার ঘুরিল। নিরঞ্জনের জ্ঞান-বার্দ্ধক্যপিষ্ট ক্রোধ একবার হৃদয় মাঝে গাঝাড়া দিল। পদাভিমান নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতার অবকাশে, সেই ক্রোধকে মুক্ত করিবার সাহায্য করিতে টান দিল। ক্রোধ মুক্তি পাইয়া কণ্ঠে আসিল, নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা টলিল। নদীতটোত্থিতা প্রাতঃস্নাতা গৃহপ্রতিগমনশীলা ললনাকুলের দ্রুত পাদবিক্ষেপজ, সিক্ত বস্ত্রের ঝপর ঝপর শব্দ, শান্ত শৈবলিনীর তরঙ্গজননী বাষ্পীয় তরণীর চাপল্যদ্যোতক ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ, আর পোর্টকমিশনরকীর্ত্তি কর্ণে তালাদাত্রী হুইসলবাদিনী লোকোমতির (locomotive) ভস্ ভস্ শব্দ—এই ত্রিগুণাত্মক শব্দের পেষণে নিরঞ্জনের গলা আল্‌গা হইয়া গেল। দ্বাররক্ষী দন্তপংক্তি কণ্ঠনির্ম্মুক্ত রিপুরাজকে বহির্গমনে বাধা দিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন হইয়া, তাহার সহিত কুস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু ধারকরা (mercenary) সৈন্যে কতক্ষণ বীর শত্রু সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে? বাঁধান দাঁত দুই এক বার কড় কড় করিল এই মাত্র, তার পর সব ফাঁক। দন্তপংক্তি হস্তাগ্রে, ক্রোধ একেবারে রসনাগ্রে। নিরঞ্জন বলিলেন,

"তোমাকে সভ্যভব্যের ন্যায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া আমার বিপরীত বোধ হইয়াছে।"

যুবক। আজ্ঞে, আপনার যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা অনেকটা সত্য। অনেকটা কেন পৌনে পোনের আনা সত্য, তাই বা কেন, একেবারে পুরা ষোল আনাই সত্য।

যুবক সরল প্রাণে কহিল কি না, যুবকই জানে; আর জানে তার স্রষ্টা। কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনের আদৌ ভাল লাগিল না। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন কথাটা রহস্যের ছলেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারও রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইল। এবং পুলিশের রহস্যময় হস্তে সেই রহস্য বুঝাইবার ভার ন্যস্ত করিবার অভিলাষটাও সেই সঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

কল্পনা ইচ্ছাসহচরী। নিরঞ্জন যেই মনে করিলেন, বিরক্তিকর যুবকটাকে পুলিশে দিব, অমনি তিনি যেন একটা লাল পাগড়ী দেখিতে পাইলেন। যেমন লাল পাগড়ী দেখা, অমনি লাল-পাগড়ীর গুহাধার সেই ভীষণ হইতেও ভীষণ লোকালয়ের সুন্দরবন, অশ্বত্থবটসহকারবেষ্টিত রক্তিম, মহাকুমার কাছারীটিও চোখের উপর আসিয়া পড়িল। রাঘব-বোয়ালই যদি দৃষ্টিজালে পড়িল, তবে তার উদরসত্ত রোহিত শফরী, এরাই বা বাকি থাকে কেন? আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে একে একে তাহারাও আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন দেখিলেন, বামে দক্ষিণে শামলা, সম্মুখে কাঠগড়া, তন্মধ্যে বিচারপ্রেমাসক্ত বেপথুমান আসামী, উপরে পাখা, নীচে মঞ্চ, হস্তে অশনিরূপিণী লেখনী, তৎপার্শ্বে বিষভরা মসীপাত্র, আর চারি ধারে কেবল বদ্ধাঞ্জলি। মঞ্চের উপরে মানময়ী, বিভীষিকাময়ী, পয়োমুখী গরলোদরী

নিজের হাকিমশ্রী। সেটাও সময় পাইয়া নিরঞ্জনের কল্পনাপথে ঢোলডিগ্‌ডিগ্‌ খেলিতে লাগিল। ভাবাবেশে নিরঞ্জন বিচার আরম্ভ করিলেন ;—"তোমার নাম ?"

যুবক। আমার নাম 'নয়।'

নিরঞ্জন। পিতার নাম ?

যুবক। আজ্ঞে, বিশ্ব,—মাতার নাম বিদ্যা।

নিরঞ্জন। জাতি ?

যুবক। আজ্ঞে কি এক সামান্য অপরাধে আমার পিতার জাতি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। এখন বল তুমি দোষী কি না।

যুবক। দোষী !—আমি !—আমি কেন দোষী হব ? আমি সকলের আগে গিয়াছিলাম।

নিরঞ্জন। সকলের আগে গিয়াছিলাম !—এ কথার অর্থ কি ?

যুবক। আজ্ঞে এ কথার অর্থ এই, আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

"কেহ ছিল না—কেহ ছিল না ?"—বলিতে বলিতে আর এক যুবক কোথা হইতে যেন কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জনের মুখ পানে চাহিয়া আবার বলিল, শুধু এর কথা শুনিয়া আপনি রায় দিবেন না। আমি সাক্ষী আনিতেছি। এই গিল্‌টী, আমি নট্ গিল্‌টী—(not guilty) আমি সকলের আগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। তখন কাক পর্য্যন্ত ডাকে নাই, চোর পর্য্যন্ত জাগে নাই, পুলিশ পর্য্যন্ত ভাগে নাই, সাহেব পর্য্যন্ত রাগে নাই। এমন কি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র তখনও পর্য্যন্ত পর-নিন্দা ছাড়ে নাই। এমনি ঘোর রাত্রিতে আমি বাহির হইয়াছিলাম।

তা হইলে বলুন দেখি, আমি দোষী কি এই দোষী। মহাশয় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবে আপনাকে গ্যাসকোইন বলিয়াছে, বাঙ্গালীতে বলিয়াছে কালাপাহাড়। আপনার ন্যায় মহাত্মার কাছে এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়া নিস্তার পাইবে?—এই আমার সাক্ষী আসিতেছে। হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে সাক্ষিপ্রবর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কয়টা লোকই পাগল হইয়াছে! ইহাদিগকে যেমন করিয়াই হউক, গারদে পূরিতে হইবেই হইবে। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"দেখ, তোমাদের সকলকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, তোমরা পথে অবৈধ জনতা করিয়া আমার বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতেছ। বেলা হইয়া গেল, তথাপি আমাকে বাড়ী যাইতে দিতেছ না।

সাক্ষী। বেশ, বাড়ীই চলুন, সেই স্থানেই ইহাদের বিবাদের একটা হেস্ত নেস্ত করুন। সেই স্থানে বিশ্রামসুখও ভোগ করিবেন, আর বিচারও করিবেন। আমাদের আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আমরা সকলেই আপনার আত্মীয়। ওই যে আপনার ফ্রেণ্ড আসিতেছেন, উনি আমাদিগের এ মোকর্দ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার বাল্য-বন্ধু সমধর্ম্মী চৌধুরী সাহেবও ডায়াবিটিস জীর্ণ করিবার জন্য প্রাতর্ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও ত বন্ধুবর বহু দূরে লিলি করিতেছেন? এতক্ষণ কি করিয়া নীরব থাকিবেন? তাই বলিলেন, তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের কথা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি।

নিরঞ্জন। তুমি কে ?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমার নাম 'প্রাংশু', পিতার নাম 'লেলোভা', পিতামহের নাম 'হ্রস্বাহু', প্রপিতামহের 'রিববামন'। মাতার নাম 'লজ্জো', আমরা ককেসিয়ান জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান শাখা। আমাদের পেশার কথা শুনিলে আপনার চক্ষে জল আসিবে। আমাদের এক প্রস্তুত পুরাণে পিশিয়াছে, এক প্রস্তুত ইতিহাসে পিশিয়াছে, শেষে প্রত্নতত্ত্ববিদে পিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জীবদ্দশায় সাহেবের লাথিতে পিষ্ট হইতেছি, মরিলেই খ্যাতি-রস পান করিয়া সংবাদপত্রের কলেবর পুষ্ট করিব।

নিরঞ্জন। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। না যাও ত পাহারাওয়ালা ডাকাইয়া দূর করিয়া দিব।

সাক্ষী। আজ্ঞে তাই দিন। নহিলে আমি নিজে যে যাই, সেরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে প্রহার করুন, অথবা পাহারাওয়ালার সেই দুর্ব্বল-নাশন বেটন দিয়া আমার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিন। আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে একটা প্রবলা ভক্তি আসিয়াছে। আমি সেই ভক্তিতরঙ্গ ঠেলিয়া পলায়ন-নদীতীরে পৌছিতে পারিতেছি না।

নিরঞ্জন দেখিলেন,—সাক্ষীর হাতনাড়া মুখনাড়া, মৃদু হাসি, সব দেখিলেন। আর ভাবিলেন, একি বিষম বিপদ উপস্থিত! কেমন করিয়া এর হাত হইতে নিস্তার পাই ?

সাক্ষী দুই একটা ঢোঁক গিলিয়া আবার আরম্ভ করিল।— "তবে এইমাত্র অনুরোধ, আমার উপর ক্রোধ করিবেন না।

আমি কেবল সাক্ষী, আসামীও নই, ফরিয়াদীও নই। শুধু সাক্ষী —হতভাগ্য সাক্ষী। আমরা পাঁচ পুরুষ একত্র হইলে কেবল মাত্র "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" কাজেই আমাদের পুরুষপরম্পরা হইতে আপনি নিষ্কণ্টকের সনন্দ পাইতে পারেন। তাহার উপরে আপনি ও আমার ভিতরে একটা বন্ধনীর আবির্ভাব হইয়াছে। কবি কালিদাস বলিয়াছেন—

নিরঞ্জন। "কি পাষণ্ড! আবার কবিতা?" এই বলিয়াই তাহার মস্তকে প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন।

সাক্ষী। আজ্ঞে কবিতা,—এখন প্রহার করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। কবিতা শুনিলে ও তাহার অর্থ বুঝিলে, আপনি আমাকে প্রহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। আপনি যতই মারিবেন, ততই আপনার আনন্দ বাড়িবে। যাবজ্জীবন এই পৃষ্ঠে ছড়ি পড়িলেও আপনার হাতে ব্যথা হইবে না। কবিতাটি এই;—"সম্বন্ধমালাপনপূর্ব্বমাহুঃ।" অর্থাৎ আলাপ করিলেই সম্বন্ধ। আপনি যে দণ্ডে আলাপ করিয়াছেন, তার পরক্ষণেই সম্বন্ধী হইয়াছেন। সুতরাং কোন দিকেই আমা হইতে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তবে ইহাদের মধ্যে এই বাবুটিই দোষী, ইহা আমি পরের চক্ষে দেখি নাই।

"কি আমি দোষী?" এই বলিয়াই, প্রথম যুবক সাক্ষীর পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল।

তখন সাক্ষী সস্মিতবদনে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এই দেখুন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উহার দুষ্কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, উনি সেই অপরাধে আমার পৃষ্ঠে মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আহা! ওঁর ননী-মাখনমাখা হাত কতই

কোমল, আর কোড়ায় কোড়ায় কড়া পড়িয়া আমার পিঠ কতই কঠিন! ওঁর হাতে কতই না আঘাত লাগিল।"

নিরঞ্জন জীবনে প্রথম দেখিলেন, পথমধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নিরপরাধে অপমানিত হইয়া, প্রতিকার-সামর্থ্যসত্বে একজন লোক হাসিল। নিরঞ্জন তার মুখে ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন না।

একটা লোক হাসিল। মার খাইয়া চোখ রাঙাইল না, গালাগালি দিল না, উকিল ডাকিল না, সমন বাহির করিল না, আমি হাকিম দাঁড়াইয়া আছি, আমার কাছেও প্রতিকার চাহিল না—শুধু মুখ মুচকিয়া হাসিল!—নিরঞ্জন তখন তাহার মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখিলেন। দেখিলেন, তার সৌম্য শান্ত বদন, দেখিলেন তার সরলতা-মাখা নয়ন, আর যেন দেখিলেন চক্ষুদ্বার ভেদ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের আবরণে ঢাকা সেই রমণী-কোমল হৃদয়। আহা, সে হৃদয় কি সুন্দর! নিরঞ্জন প্রথমে বুঝিলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কখন কখন আসামীও হাকিমের বিচার করিতে পারে।

নিরঞ্জন চিত্তসংযম না শিখিলে হয় ত তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া ফেলিতেন,—

"বঁধু! কি আর বলিব আমি?
জনমে জনমে মরণে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি!"

তাহা না করিয়া সেই উদ্ধত প্রহারকারী যুবকটাকে তিরস্কার করিলেন। তাহার তিরস্কারে প্রশ্রয় পাইয়া দ্বিতীয় যুবক সাক্ষীর হইয়া প্রথমকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তখন দুই জনে

আবার লড়াই বাঁধিয়া গেল। নিরঞ্জন প্রাণপণ চীৎকারে পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন। এক দিক হইতে পাহারাওয়ালা, অন্য দিক হইতে মিষ্টার চোঙদার আসিয়া পড়িলেন। চোঙদার আসিয়াই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিষ্টার সেন ব্যাপার কি ?"

নিরঞ্জন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। পাহারাওয়ালাকে বলিলেন,—"এই দো আদমিকো পাকাড়ো।"

পাহারাওয়ালা আসিয়া যোদ্ধৃযুগলকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। নিরঞ্জন তার আচরণে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় গন্‌গন্ করিয়া বলিলেন—"ক্যা দেখ্‌তা হ্যায় গাধা! জলদি পাকাড় কর।"

পাহারাওয়ালা কিছুই না করিয়া কেবল সেলাম ঠুকিতে লাগিল। আর বলিল,—"হুজুর উতো অনাহারী হুজুরকো লেড়কা হয়।"

নিরঞ্জন সে কথায় কাণ দিলেন না, রুক্ষতর স্বরে বলিলেন,—"জলদি পাকাড় কর।"

চোঙদার বলিলেন,—"আরে ভাই রাগ করিও না, থামো থামো।" তখন নিরঞ্জন বলেন ধর ধর, চোঙদার বলে থাম থাম, যোদ্ধৃদ্বয় বলে ড্যাম্ ড্যাম্, সাক্ষী বলে কর কি কর কি, পাহারাওয়ালা বলে আরে বাবু আরে বাবু জখম হোগা। দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। তাহারা বলে লাগাও লাগাও। চোঙদার মাঝে পড়িয়া যেতে দাও যেতে দাও বলিতে বলিতে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। বাহিরের বিবাদ থামিয়া গেল, তবে যা একটু আধটু রহিল, তাহা কেবল পাহারাওয়ালার জনতাভঙ্গের জন্য। কিন্তু নিরঞ্জনের অভ্যন্তরে নানাজাতীয় চিন্তা আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

সাক্ষী তখন বলিল, "আপনি আর দাঁড়াইয়া কি করিবেন, ঘরে যান, ইহাদের বিবাদ মিটিবে না।"

চোওদার বলিলেন, "না সে বিবাদ মিটিবার নয়। উহারা উভয়েই দোষী।" নিরঞ্জন বলিলেন "কিসের বিবাদ?—কিসের দোষ?"

চোওদার। এই ত দাদা, তুমিও সময় বুঝিয়া নেকা হইলে, এ বিবাদ হইত না, উহারা যদি আমার কাছে আসিত। যাও ভাই বেলা হইয়াছে। উহাদের বিবাদ কখন মিটিবে না। এই বলিয়া চোওদার হস্তকম্পন করিয়া চলিয়া গেল। যুবকদ্বয়ও অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সাক্ষী গঙ্গাতীরে একটা জেটীর উপর উঠিয়া গান গাহিল,—

"ওরে আমার মাছি!
আহা কি নম্রতা ধর এসে হাত জোড় কর,
কিন্তু কেন বার কর তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি?
ওরে আমার মাছি!"

নিরঞ্জন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সেই গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "এ কণ্ঠস্বর যে শুনিয়াছি, এ কণ্ঠস্বর যার, তারে যে দেখিয়াছি! সে যে একবার পঞ্চমবর্ষীয় বালক বেশে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাননিকার বায়না থামাইয়াছিল। তার পর যে সে অদৃশ্য হইয়াছিল।—তার পর দূরের সঙ্গীতমূর্ত্তিতে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল!—সে কি এই সাক্ষী!—সাক্ষী কি অন্তর্য্যামী। না, হইল না,—গৃহে যাওয়া হইল না। সাক্ষীকে গ্রেপ্তার না করিয়া গৃহে ফিরিব না, সে যা বলিল, সব যে ঠিক! মাছির মতন প্রথম ছেলেটা আসিল;

তাড়াইলেও নড়িল না। হাত জোড় করিল, নম্রতা দেখাইল, তার পর বুকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। কি অস্ত্র বুঝিতেও দিল না। "সাক্ষী সাক্ষী"—জেটীর কাছে গিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কই সাক্ষী, কোথা সাক্ষী—কোথা হইতে আসিল কোথায় গেল!

নিরঞ্জন তাহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি যষ্টি পর্য্যন্ত তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেই যষ্টি তাঁহার ক্রোধের উপর এমন প্রহার করিয়াছে যে, তাঁহার হৃদয় এখন "নলিনীদলগতজলমিব তরলং।" নিরঞ্জন এখন সাক্ষীর প্রেমে আকৃষ্ট। নিরঞ্জন এখন নদী, সাক্ষী সাগর; নিরঞ্জন রাধা, সাক্ষী কৃষ্ণ। সাক্ষী সাক্ষী করিয়া নিরঞ্জন জেটীবনে কত ঘুরিলেন, দেখা পাইলেন না। শেষে মান করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, সাক্ষী যাইবে কোথায়? সে যে আমার বাল্যসখা চোঙদারের পরিচিত। যদি কখন কাননিকার বিবাহ দিই এই যুবাকেই দিব। কিন্তু কাননিকার বিবাহ দিব কি? প্রাণটা যে কেমন কেমন করিতেছে! তা যাউক একি! চোঙদারই বা বলিল কি? সেই দুই জন অপরিচিত যুবকই বা আমার সম্মুখে কি নাটকের অভিনয় করিল? তাহাদের এক কথাও যে বুঝিতে পারিলাম না! তাহারা কি কাননিকে বিবাহ করিবার জন্যই খুনোখুনি করিতেছে!

ওকি! ওই বই-ফিরিওয়ালা কি বলিতেছে! "হায় কলির একি গুণ এক কবিতায় পাঁচটা খুন।—এক এক পয়সা।"—নিরঞ্জনের অন্যমনস্কতায় পকেটে হাত পড়িল। তাহা হইতে একটি পয়সা বাহির হইল। আর তার বিনিময়ে তাহার হাতে সেই এক পয়সার বই খানি আসিল। প্রথম পাত খুলিয়া দেখেন, লেখা

রহিয়াছে—কি লেখা রহিয়াছে! অরুণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের দৃষ্টি অবরোধ করিতে বইয়ের প্রথম পত্রেই প্রথম ছত্রেই ও কি লেখা রহিয়াছে! "ডেপুটীকুল-ধুরন্ধর নিরঞ্জন সেনের জগদ্ধাত্রী দৌহিত্রী কবি কাননিকা কান্তগির কই—" মহাক্রোধে নিরঞ্জন বইখানা দূরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, হাতখানা একটা নরস্তম্ভে আহত হইল।

নিরঞ্জন। কে তুমি?

স্তম্ভ। আমি সম্পাদক।

নিরঞ্জন। ইংরাজী?

স্তম্ভ। বিজাতীয় ভাষায় কে কবে মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে! আমরা অর্থলোভ, পদলোভ, আশালোভ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, দুঃখিনী কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই আনন্দদায়িনী শত-গ্রন্থিবাসা মাতৃভাষার সেবা করিতেছি।

নিরঞ্জন। কাগজে গাল পাড়িয়া রাগ মরে নাই, তাই কি সুমুখে গালাগাল দিতে আসা হইয়াছে?

স্তম্ভ। আজ্ঞে, আড়ালে যা করিয়াছি তা করিয়াছি। সুমুখে আপনার পায়ে ধরিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জন। যাও যাও, আমার সুমুখ হইতে দূর হইয়া যাও।

স্তম্ভ। আজ্ঞে রাগ করিবেন না। এই দেখুন, দেখিয়া মারিতে হয় মারুন, কায়ে রাখিতে হয় রাখুন। এই বলিয়া একখানা পুস্তক নিরঞ্জনের মুখের কাছে ধরিল।

নিরঞ্জন। একি?

স্তম্ভ। কাননিকা দেবীর পুস্তকের সমালোচনা।

নিরঞ্জন। বই কই?

স্তম্ভ। আজ্ঞে!

নিরঞ্জন। আজ্ঞে কি? বই কই?

নিরঞ্জন। কি বিপদ। তুমি কোথাকার গণ্ডমূর্খ! সমালোচনা ত দেখিতেছি, কিন্তু বই কই?

স্তম্ভ। বই আপনার ঘরে। বইএর নাম কই! কেন, আপনি কি তাহা পড়েন নাই? এক মাসে তার ত্রিশ সংস্করণ হইয়া গেল। সেই যে দুই জন বাবু সর্ব্বপ্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহারাই একখানা বই লইয়া মারামারি করিয়াছিল। কিন্তু আমি তেমন অসভ্য নই। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, আর নোট করিতেছিলাম।

নিরঞ্জন তখন ব্যাপারটা একটু একটু বুঝিতে পারিলেন; তিনি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্পাদক ইত্যবসরে তাঁহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। "হাঁ হাঁ কর কি কর কি!"—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া যেমন তিনি চলিয়া যাইবেন, অমনি আর এক জনের ঘাড়ে পড়িলেন।

নিরঞ্জন। তুমি আবার কে?

জন। আজ্ঞে আমি।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে আমি!—

জন। আজ্ঞে আমি সিবিল সার্ভিস দিতে বিলাত যাইব।

নিরঞ্জন। তাতে আমার কি?

জন। আমি উচ্চবংশোদ্ভব।

নিরঞ্জন। আমি না হয় নীচবংশোদ্ভব—আমাকে কি প্রহার করিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে অমন কথা বলিবেন না, আপনি দেবতা। আমি অতি পরিশ্রমী, আর আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কেহ কখন কিছু জানে না।

নিরঞ্জন। বটে! তবে ত তুমি সেণ্টপল হে। কিন্তু সেণ্ট-পলের এমন অসময়ে পবলিক প্লেসে (public place) আবির্ভাব হইল কেন? আমাকে কি কনভর্ট (convert) করিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে আমি ভাল ক্রিকেটিয়ার, ভালতর সওয়ার, ভালতম বেলুনিষ্ট। আমি উত্তম গাহিতে পারি, ভাল পল্‌কা নাচ নাচিতে পারি। আর বলের কথা ত বুঝিয়াছেন—আপনি পড়িতে পড়িতে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।

নিরঞ্জন হতাশ চক্ষে চারি ধারে চাহিলেন—তাঁহার প্রাণ নীরব হইয়া আসিতেছে, কে তাঁহার হইয়া এ পাগলের কথার উত্তর করিবে? দূরে একটি নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিল। সেই অন্তর্যামী সন্ন্যাসী তাঁর মনোভাব বুঝিয়াই যেন বলিল, "ওর কথায় বিশ্বাস করিবেন না। ওর একটি বিবাহ আছে।"

জন। আমি সেই অস্পর্শীয়া অশিক্ষিতাকে ডাইভোর্স (divorce) করিব।

সন্ন্যাসী। আমায় একবার দেখুন, আমি ঘরবাড়ী সব ত্যাগ করিয়াছি, গেরুয়া ধরিয়াছি। কে আমার আজ এ দশা করিয়াছে? দেখুন, একবার দেখুন, আমার কি চেহারা হইয়াছে। আমার বাড়ী, আমার ঘর; কিন্তু হায়! আমি আজ কোথায়?

বুদ্ধিমান নিরঞ্জন এতক্ষণে সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়াই হনহন করিয়া বাড়ী চলিলেন। চারি দিকে—আহা উহু হায় হায়, রে রে, গেলাম মোলাম, কিচির মিচির ড্যাম ভিলেন, টিপঢাপ শব্দ

শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আর কোনও দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন না।—ঘরে গিয়া একেবারে সোফায় শুইয়া চাকরকে বলিলেন "জল দে।" কিন্তু জল কই? এ সংসার যে মরীচিকা! নিরঞ্জন জল বিনা টা টা করিতে লাগিলেন।

জল আসিল না, কিন্তু রাশি রাশি পত্রিকা কোথা হইতে যেন আসিয়া ঝুর ঝুর করিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নিরঞ্জনকে লজ্জার "হরিণবাড়ীর" মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্য দেবকন্যাগণ নীল গগন হইতে লাজবর্ষণ করিতেছে।

নিরঞ্জন সেইগুলি কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, কাহারও উপরে লেখা কুমারী কাননিকা কাস্তগির। কাহারও উপরে কবি-কুমারী। ছন্দোবন্ধননিপুণ কোন লেখক পত্রের শিরোনামা লিখিয়াছেন, কুমারী কাস্তগিরী। চটুলচাটুপটু কোন মহাত্মার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, রমণীকুলতিলকা কবি কাননিকা কাস্তগৈরিকা। কেবল খান কয়েক পত্র ভামিনীর, আর এক পত্র তাহার নিজের।

নিরঞ্জন অগ্রে নিজের পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন।

(১ম পত্র)

নমস্কার নিবেদনং

নীরবতাই প্রাণের কথা। ভালবাসা আপনাকে চেনে না, আপনাকে চিনাইবার কৌশলও জানে না। আপনি বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করিবেন। আজ প্রাতঃকালে বোধ হয়, সহস্র পত্র-কুসুম আপনার পাদমূলে পতিত হইবে। তাহাদের প্রাণোন্মাদক গন্ধে হয় ত আপনাকে উন্মত্ত করিবে। সাবধান, বিচলিত হই-বেন না। অনেক "আপনার লোক" চারি ধার হইতে আসিয়া আপনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। সে চক্রব্যূহ ভেদ করিতে আপনি

সমর্থ হইবেন কি?—"আপনার লোক" খুঁজিতে হয়। আপন হইতে আপনার, সেই ভালবাসাময় পরম প্রেমিক, পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে খুঁজিতে পৃথিবীর মানব সৃষ্টিকাল হইতে আজীবন পরিশ্রম করিতেছে। অধিক আর কি বলিব? এইখানে আমার চক্ষে জল আসিল। আপনি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, সেই জন্য এই অজ্ঞাতকুলশীল আজি হইতে নীরব হইল।

অনুগ্রহভিখারিণঃ

কস্যচিৎ অজ্ঞাতভাগ্যস্য।

নিরঞ্জনের বিস্ময়ের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। অনেক বার বিস্মিত হইয়াছেন, আবার বিস্মিত হইলে, ভাষা হইতে সমস্ত বিস্ময়ের খরচ হইয়া অভিধান হইতেও যে কথাটা উঠিয়া যাইবে! বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তাঁহার কৌতূহল হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা থাকে, আজ সমস্ত চিঠি পাঠ করিব।

ভাবিয়া ভামিনীমণির চিঠি খুলিলেন।—চাকর চা লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত চিঠি আজ কে পাঠাইল, বলিতে পারিস?"

চাকর বলিল, "কতকগুলা ডাকহরকরা দিয়া গিয়াছে, কতকগুলা বেয়ারায় আনিয়াছে, কতকগুলা বাবুরা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর কতকগুলা কেমন করিয়া পাইয়াছি মনে নাই, আর কতকগুলার কথা মনে আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলা এখনও আসে নাই।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলা?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলার মধ্যে কতকগুলা লেখা হইতেছে, কতকগুলার এখনও কাটাকুটী চলিতেছে, আর কতকগুলার কাগজের জন্য বালির কলে চিঠি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। আর তোমার মুণ্ডপাত হইতে যে এখনও বাকি রহিয়াছে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

চাকর মস্তক অবনত করিল, আর বলিল,—চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

নিরঞ্জন কি বুঝিয়া আবার বসিলেন,—চাকরকে আর প্রহার করিলেন না। বলিলেন, "চা রাখিয়া চলিয়া যা।"

চাকর আদেশ পালন করিল, নিরঞ্জন আবার পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

(২য় পত্র)

প্রিয় সখী ভানু!

এই অভাগিনী লেখিকাকে চিনিতে পার কি? আর কেমন করিয়াই বা চিনিবে!—সেই সেকাল আর একাল। ত্রিশ বৎসর আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্না। কিন্তু ভাই মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, সেই তোমার আমার মানস-রচিত অচ্ছোদ সরোবর! যে সরোবরের তীরে নবাগতযৌবনা দুইটী সখী, হাত-ধরাধরি—উপরে আকাশ, নীচে বসুমতী, আকাশে নক্ষত্র, স্নিগ্ধোজ্জল, অগণ্য অনন্ত—ভূমে তৃণক্ষেত্রে—সুদূরবিস্তৃত শ্যামল সুন্দর! মনে পড়ে না কি, অচ্ছোদের ঢল ঢল নীলজল, নীলাম্বরী প্রকৃতির গায়ে সোহাগ করিয়া জলের উপর জল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দিয়া, সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লারকে বলিতেছে, চাঁদ

আসিতে এখনও দেরী আছে? চারি ধারে সুন্দরে সুন্দরে মেশা-মিশি, দুইটী ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আশার রাশি। তাহাদের চক্ষে তখন সকলি সুন্দর—চাঁদ সুন্দর, আঁধার সুন্দর, ধরণী সুন্দর, শূন্য সুন্দর। এই সকল সুন্দরের মধ্যে দুইটী সুন্দর বালিকা আরও কি সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, মনে পড়ে কি? ভাই! সেই অচ্ছোদতীরে কার সঙ্গে কবে কার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল? মহাশ্বেতে! কোথায় সেই পুণ্ডরীক? আর আমি অভাগিনী কাদম্বরী—কোথায় আমার সেই চন্দ্রাপীড়? তুমি চাহিতে সরসীজলে, আমি চাহিতাম নভোমণ্ডলে। প্রিয়সখী ভানু! আর এক বার জিজ্ঞাসা করি, মনে পড়ে কি?—ভাই, মানবজীবন চোখ বুঝিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু একবার আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে কি তাই? তুমি কোথায় আমি কোথায়? তোমার দাম্ভিক পিতা (ভাই রাগ করিও না) তোমায় কোথায় রাখিয়াছে, আমার মূর্খ পিতা আমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে। এখন একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাকি একটি ভুবনমোহিনী কন্যা হইয়াছে! তার রূপগুণে নাকি সমস্ত বঙ্গ পাগল! ভাই আমারও একটি ভুবনমোহন পুত্র আছে। তার রূপগুণে সমস্ত বাঙ্গালা না হউক, অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাগল—বিশেষতঃ শিক্ষিত শিক্ষিতা মণ্ডলের ভিতর পাগলামীটা কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভাই! আবার কি তোমার অভাগিনী সখীকে তোমার আদরের ঘরের এক কোণে স্থান দিবে? আমার পুত্র ও তোমার কন্যা দুইটী সুন্দর এক সঙ্গে করিয়া, সুন্দর দেখিবার সাধ মিটাইবে?—প্রিয় সখী আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া উঠিল না, এস না আমরা সেই অমূল্য সাম-

প্রীটী দুইটী যুবক যুবতীকে দিয়া, কঠোর বিধাতার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করি। ভাই, বিধাতা আমাদের যে দুঃখ দিয়াছে, তুমি না হইলে আর কেহ তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে না। তোমার পিতা বিধাতার উকীল হইয়া এবারেও যদি এ বিবাহে প্রতিবন্ধক হন, তাঁহাকে বলিও, আমার পুত্র উচ্চবংশোদ্ভব,—অর্থাৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে। আমার রাশি রাশি ভালবাসা পাঠাইলাম। তুমি যত পার লইও, তোমার কন্যাকে যত পার দিও। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তোমার ভগিনীদ্বয় ও তাহাদের কন্যা-গুলিকে দিও। তোমার প্রিয় পিতাকে একটু আধটু দিলেও দিতে পার। কেন না, তিনি তোমার মত প্রেমময়ীর পিতা।

প্রণয়ভিখারিণী অভাগিনী
কামিনী

পত্র পাঠ করিয়া নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। রাগের মাথায় আর এক খানা পত্রচ্ছদের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অক্ষরগুলা অতি ভয়ে যেন এ তার ঘাড়ে ঢলিয়া পড়িল। কোন-গুলা বা জড়াজড়ি করিয়া, নিরঞ্জন যাহাতে চিনিতে না পারে, এমনি ভাবে মুখের উপর মসীর আবরণ দিল যে, আর কেহ হইলে তাহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটির অশূন্যকরণ যন্ত্র-মুখে ফেলিয়া দিত, সেখানে তাহারা অণুবীক্ষণে পিষ্ট হইয়া বিজয়া বটিকা বড়ীর মত একটী একটী করিয়া কল হইতে বাহির হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কি ছাড়িবার পাত্র! তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাষ্ঠ-লৌকতায়, তাহারা হাসিতে হাসিতে সরিয়া বসিল। নিরঞ্জন দেখিলেন :—

(৩য় পত্র)

প্রিয়া ভানু!

করছিস্ কি? আমার লেখা দেখে বুঝ্‌তে পেরেছিস কি, আমি কে? পাঁচ বৎসর রাউলপিণ্ডিতে ছিলুম, তিন বৎসর বোম্বায়ে, দুই বৎসর লণ্ডনে, এক বৎসর প্যারিসে। তবু দেখ্ আমি কেমন ভাষা বাঙ্গলা লিখ্‌তে পারি? আর আমার গুণধর আমাকে আন্‌তে গিয়ে, মাস দুয়ের জন্য সেখানে থেকে সব বাঙ্গলা ভুলে গেছে। তোর অজবুক বাপ তোকে যদি একটা সিভিলিয়ান দেখে যে দিত, তা হলে আমার মতন তার স্কন্ধে চাপিয়া কত দেশ বিদেশ দেখ্‌তিস্। বিলেতফেরত পুরুষগুলো পরিবারকে এ দেশে রাখ্‌তে বড় নারাজ। আমার গুণধর বলে, তুমি সেইখানেই আজীবন বাস কর, আমি কেবল মনের সাধে চিঠি লিখি। আহা ভাইরে! বিলেত কি সুন্দর! তিন বৎসর ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি একেবারেই ছিলুম না। এই তিন বৎসর ভুলের ভেতর বাস করে, আমার প্রাণটা যেন ভুলময় হয়ে গেছে। ভাই, আমার সঙ্গে বিলেত যাবি? সেখানে দুই দিন বাস করিলে, পোড়া ভারতের কথা আর মনেই থাকে না। বেশী আর কি বলিব সই, সোয়ামী বলে যে একটা জিনিষ আছে, এও আমি এক দিন ভুলে গিছলুম। সেই দিন ভাগ্যে চিঠি পেয়েছিলুম!—

"তোর বিলেতের কাঁথায় আগুন," বলিয়াই নিরঞ্জন চিঠিখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পড়িতে পড়িতে পত্রখানা উল্টাইয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিলেন অপর পৃষ্ঠায় একটী ছবি আঁকা। "আরে মর্ এ আবার কি!" বলিয়া তিনি আবার কুড়াইলেন।

আবার সেই ছবির ধারের ধারের লেখাগুলা পড়িতে লাগিলেন। "এইটাই সেই প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র পুত্রের ছবি। ছবির সুখ্যাতি, আর সেই সঙ্গে এই গুণহীনা চিত্রকরীর গুণ ব্যাখ্যানা এর পর যত পারিস্ করিস্। এখন বল্ দেখি, এ ছেলে কি সুন্দর নয়? তাই, আমার বিবেচনায় এই ছেলেই কাননিকার যোগ্য পাত্র। সে বরাবর বিলেতেই ছিল। এক লর্ডের মেয়ে তারে বে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু তোর মেয়ের কবিতা পড়ে সে পাগল হয়েছে। বলে, তারে না পেলে আমি এক ডুব দিয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে যাব। সে যে ছেলে, তা সে করতে পারে। কিন্তু ভাই, পার হতে গিয়ে যদি আটলাণ্টিক কেবেলে (cable) আটকে যায়! তা হলে আমার প্রিয়তম বন্ধু পুত্রশোকে কি কর্‌বে! সে যে ভাবতে গেলে বুক ফেটে যায় ভাই! আমার অনুরোধ, কাননিকাকে ভারজিনিয়ামোহনের হাতে সমর্পণ কর্। তোর মেয়ে খুব সুখে থাকবে। বিলেতে থাক্‌বার এমন সুবিধে আর পাবি না।

তোরই চন্দ্রা।

নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দুই খানা পত্রই অনলমুখে সমর্পণ করিবেন। এত বড় স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রা জ্ঞানহীনা অবলা নারী আমাকে দাম্ভিক অজবুক বলে? নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তাহার কেমন এক রকম হইয়া গেল। রমণীকুলের জন্য নিরঞ্জন না করিয়াছেন কি? সেই রমণীই কি না তাহাকে পরিণামে এই কটুরসাধার সার্টিফিকেট উপঢৌকন দিল! অথবা এই দুইটা পত্রলেখিকাই রমণীত্ব হারাইয়াছে। আশা আসিয়া তাহার প্রাণের দ্বার দিয়া বার দুই গুণ-

গুণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, সকল নারীই কি এই দুইটার মত। দেখি দিখি আর একখানা পত্র খুলিয়া।

(৪র্থ পত্র।)

আর কেন ভামিনী! এখনও কি তোর জ্ঞান জন্মিল না। কাননিকার দিকে যে আর চাওয়া যায় না! তোর বাপ বৃদ্ধ বয়সে মতি হারাইছে বলিয়া কি তুইও সেই সঙ্গে পাগল হইলি! ক্ষুদ্র বালিকার চোখের উপর ঘটকালির ভার দিয়া তুই ও তোর অহঙ্কৃত পিতা নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কন্যা কি ভবিষ্যতে সুখী হইবে মনে করিয়াছিস্! লাবণ্যময়ী ও আমার এক সঙ্গেই না বিবাহ হইয়াছিল? লাবণ্যময়ী ষোড়শী—পতি বাছিয়া লইল, আর আমি বালিকা—পিতৃহীনা, অভিভাবকহীনা, দয়াবান প্রতিবেশিগণের সাহায্যে পাত্রস্থা হইলাম। হায়! আমার সুখের একটীমাত্র কণাও যদি সে হতভাগিনী পাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে আফিং খাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত না। আমার স্বামী বলেন, অনেক হতভাগ্য উন্নত মনে মনে অহিফেনের মাঠ পর্য্যন্ত গিলিয়া বসিয়া আছে। নিজেরাই পথ-প্রদর্শক, কাজেই কাষ্ঠহাসির বাক্সের মধ্যে প্রাণটি পুরিয়া রাখিয়াছে, লাইসেন দিবার ভয়ে বাহির করে না। যাক্, আমি আর বলিয়া করিব কি? তোরাও ত বুদ্ধির সাগর! দুই জনে পড়িয়া অমন শান্ত সরল রমণীচরণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিস্। —তোর বাপ পণ্ডিত, তোর বাপ হাকিম, সে কত লোকের মাথা তোপে উড়াইয়া দিয়াছে। উপদেশ দিতে যাইয়া কি আমার মাথাটাও উড়িয়া যাইবে? আমার গুণধর স্বামী আমার শত দোষেও ত আমাকে ত্যাগ করিবে না। শেষে কন্ধকাটা

মাগ লইয়া শেষ জীবনটা কি কাঁদিয়া কাটাইবে!—আমিও তার কান্না দেখিতে পারিব না, কাজেই আমাকেও চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তোরে বড় ভালবাসি বলিয়া এতগুলা কথা লিখিলাম। তোর সেই চাণক্য পণ্ডিত বাপকে আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া বলিস্ যে, হরিদাসী বলিয়াছে, এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে তিনি যেন নিজে দেখিয়া কাননির বর আনিয়া দেন। ভাই, আর লেখা হইল না, বৌমা রাগ করিয়া ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলিয়া সংসারের কাজ দেখিতে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।

গাল খাইয়া জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম নিরঞ্জনের প্রাণ জল হইয়া গেল। পাঠান্তে নিরঞ্জন এই তীব্র সমালোচিকার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, যে হৃদয় বিঁধিতে জানে, তার ভাষার আর তীব্রতা কোমলতা কি!—ইংরাজী বাঙ্গালা কি!—তাহা হইলে কাননিকার লেখায় সমস্ত বাঙ্গালার মুগ্ধ হওন বিচিত্র ত নয়! রাক্ষসী! তোর মাথা কাটি আর নাই কাটি, সেই পাপীয়সী ছুটার মাথা কাটিব।

ভাল, কাননিকার বরকুলের মধ্যে পাত্র মিলে কি না, দেখা যাউক।

(৫ম পত্র)

প্রভাতের হাসি ভরা দূর আকাশে
সোণার চিবুকে হাত কে তুমি বসে?
ওগো তুমি কি ভাবিছ,
ওগো তুমি কি করিছ,
মুকুতা-নিঝর কেন গলে উরসে?

প্রাণে কি করিছে খেলা
বল না গো এই বেলা ?
সব সুখী তুমি কেন মুখ বিরসে ?
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে ?

রাঙা রাঙা মেঘগুলি ভাসে দু' পাশে।
সোণায় সোণায় খেলা সোণার দেশে।
কেউ আসে যায় চলে,
কেউ গায়ে পড়ে ঢলে,
কেউ ঝরে ঝরে যায় কেশ-পরশে।
কেউ বা অলক ধরে,
কেউ দূরে মান ক'রে,
গলিয়া গলিয়া যায় নীলায় মিশে।
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।

প্রভাতের সমীরের শীত-পরশে
ওই ছোট পাখী-মণি শাখায় বসে।
মাথা নাড়ে, পাখা ঝাড়ে,
থাকে থাকে প্রাণ কাড়ে,
এ ডাল ও ডাল হ'তে সুধা বরষে।
সে যে কিছু বুঝে না গো,
সে যে কভু ভাবে না গো,
কোথা হ'তে কেন প্রাণে যাতনা আসে,
কেন তুমি ম্লানমুখে দূর আকাশে।

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে
ঢলেছে অচল কোলে নিশি আলসে।
হয়ে পাগলের পারা,
ডুবে গেছে যত তারা,
একা তোমা ফেলে গেছে পথের পাশে।
আর কেন এস সই,
এ হৃদয়ে তুলে লই ;
বসে মোর হৃদয়ের লুকান দেশে
পঞ্চমে তুলিয়া তান গাও বিভাষে।

নিরঞ্জন একটি একটি করিয়া অক্ষর গণিয়া কবিতাটী পড়িলেন। দেখিলেন আট তেরো, তেরো আট অক্ষর কুসুমে মালার গাঁথনি। ভাবিলেন, এ আবার কি ছন্দ! পয়ার ত্রিপদী চৌপদী এ সকল ত নয়ই, চম্পক তোটক তূণক নয়, আমোদিনী আদরিণী অমৃতলহরী, তাও নয়। তবে কি উন্মাদিনী? বাল্যকালে নিরঞ্জন ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। যতদিন না তাহার মনে বাঙ্গালার উপর ঘৃণা জন্মিয়াছিল, যতদিন তিনি দেশে ছিলেন, ততদিন সেই গুলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন। কবিতার দুই এক ছত্র পড়িতে না পড়িতে ক্রোধে তাঁহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, আর কবাট লাগিল না। অসতর্ক নিরঞ্জনের মুখ হইতে যেন ছন্দবোধ-শব্দসাগর হড় হড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, তবে কি উন্মাদিনী? কই একবার মিলাই দেখি!—

"বুক ফেটে রক্ত উঠে মরুক্ মরুক্ মরুক্,
মুখে রক্ত উঠে মরুক।
এখনিই ওলাউঠা ধরুক ধরুক ধরুক
এসে ওলাউঠা ধরুক।"

না, তাও ত নয়, এ যে কোনও ছত্রের অক্ষরের সঙ্গে মিলিল না!—তবে কি কুঞ্জলতিকা?—

"আর ত বাঁচিনা প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥"

তাই বা হইল কই? তবে বুঝি প্রকারান্তর মালতী!—

"রমণীজনম আর কেহ যেন লয় না।
যদি লয় তবু যেন কুলবধূ হয় না॥"

আহা হা! হইল না! প্রথমটা তের, দ্বিতীয়টা আট হইলেই যে হইত রে! তা হইলে নিশ্চয়ই মালতীলতা।

প্রিয়ে শুনলেতো শুনলেতো শুনলে!

তবে না কি মিলবে না! এই যে তের গো!—কিন্তু আট কই?

"প্রিয়ে শুনলেতো শুনলেতো শুনলে!
হ্যাদে যটু পাপে পটু কত কটু বল্‌ছে।
কি বল্‌ছে কি বল্‌ছে?"

আট পাইয়া নিরঞ্জন উৎসাহে মালসাট মারিয়া আবার বলিলেন,

"অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বলছে
ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে ঐ জ্বলছে।"

যা—আবার গোল বাধিয়া গেল। আটি আটা হইয়া সমস্ত

অক্ষর জড়াইয়া ফেলিল। তখন কাজেই নিরঞ্জনের সকল আশা বিষাদিনী। মুখ হইতে বাহিরও হইল বিষাদিনী।

"প্রাণে আর সয় না,
প্রাণে আর সয়নারে প্রাণে আর সয়না।
খোঁপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা করে মত নেড়ে
ঠেকারে বাঁচেনা আর গায়ে দিয়ে গয়না।"

যখন কিছুতেই মিলিল না, তখন ক্রোধোন্মত্ত নিরঞ্জনের মুখ হইতে শাসক ছন্দ বাহির হইল। তিনি ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—

"কোথাকার কেটা তুই কোথাকার কেটা?
কি তোর বাপের নাম তুই কার বেটা?"

বলিয়াই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন কবিতার ভাব আসিয়া তাঁহার চোখের পলক চাপিয়া তাহার উপর একটা ছবি তুলিয়া ধরিল। নিরঞ্জন ঘুমাইতে ঘুমাইতে দেখিলেন, কে যেন সোণার চিবুকে হাত দিয়া প্রভাত-আকাশের হাসির ভিতর বসিয়া আছে। চোখে জল ঝরিতেছে, যেন এক একটী মুকুতা পৃথিবীর কমল-শোভনা সরসীর স্থির জলে টুপ টাপ করিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে কে যেন আসিয়া সেই মুকুতা ধরিতে জলে ঝাঁপ দিল। এক হাতে কাগজ, আর হাতে লেখনী—সরোবরে জল, জলে কমল, কমলে মৃণাল, মৃণালে কণ্টক, আর মৃণালের কণ্টক গড়া বিধি—সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবুক কবিকে ধরিয়া রাখিল। কবি আর তাহাদের আদর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না; জন্মের মত ডুবিল। পাখীর কি? সে পূর্ব্ববৎ গাছে বসিয়া পাখা নাড়িতেছে, আর

গান গাহিতেছে। চাষার কি? সে হল কাঁধে যুগবাহী বলদকে শ্বশুরকুলের বংশরক্ষকত্ব ভার দিয়া, দ্রুত চালাইয়া মাঠ পানে চলিতেছে। নলিনীর কি? সে প্রতিদিন যেমন সরসীর জলের মৃদু হিল্লোলে দুলে, আজিও তেমনি দুলিতেছে। কে জলমগ্ন কবির দুঃখ দেখিল? কে তার জন্য নিজের কাজ বন্ধ দিল? তৃষাতুর পথিক সেই জল পান করিল, বালকে সাঁতার কাটিল, রমণী কলসী কলসী সতরঙ্গ জল তুলিল। পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন সমেত অন্ন রাঁধিল, গৃহস্থের পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত আস্বাদ সাধে বাদ যাইল না। এ সংসারে যে গেল, সেই গেল।

নিরঞ্জনও কবিকে জলের ভিতর বাস করিবার অনন্তকালের মত ভার দিয়া, আকাশ পানে চাহিলেন। আর মনে মনে বলিলেন "হে আকাশচারিণী, জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোণা তোমাকে আমি মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই? কেন না, তুমি সেই একঘেয়ে জীবন-যন্ত্র-পরিচালক বাঙ্গালীর ভিতরে এক অভিনব নূতনত্ব দেখাইয়াছ। তুমি ঘর হইতে আফিস আর আফিস হইতে ঘর না করিয়া একেবারে মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছ।—তুমি কে? কত লোক তোমাকে দেখিয়া চলিতে চলিতে কূপে পড়িল, কত লোকে জহ্নুকন্যার কোমল কোলে ঝাঁপ খাইল। কত লোকে ওই নীল সাগরের এ পারে বসিয়া—নীরব একেলা শুধু চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত নীলাম্বুনিধিই গড়িয়া ফেলিল, আর তুমি হে বাহিতে, হে ভুক্তিপ্রদে, নীল নীরদে ঠেশ দিয়া আপনার মনে মাটি পানে চাহিয়া, সোণার চিবুকে হাত দিয়া সকলকে কদলী বৃক্ষের সেই সাহেবপ্রিয় কলটি দেখাইতেছ, আর কাঁদিতেছ। হে তন্বী, হে নীলনলি-

নাতনয়নে, তুমি কে? কেবল কাঁদিতেছ!—একবারও ভাবিতেছ না, ওই সংক্রামক ক্রন্দন রোগে সমস্ত দেশটা অকালে কালগ্রাসে পড়িতে চলিল! একবারও ভাবিলে না, সহস্র নয়নের আকাজ্ক্ষার টানে, তোমার ওই সজল-নীরদ-সেবিত দেশ কালে জলশূন্য হইয়া একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া পড়িবে। একবারও ভাবিলে না, যেখানে একটা অশ্রুবিন্দুও মুহূর্তের জন্য স্থির থাকিতে পারে না, যেখানে সম্মিলিত দুইটি মাত্র জলদকণাও দেহভারে স্থানচ্যুত হয়, সেখানে—সেই শূন্যে হে তন্ময়ী, হে জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোণা, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে! তুমি যেই হও, তুমি যে 'ইনী', তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে তোমার পানে এত লোক চাহিবে কেন?—তাই বলি হে কিসলয়-কোমলে বরাভয়করী কুমারী, তুমি সোণার তরীতে চাপিয়া ওই সোণার সাগরের জল কাটিয়া ঢেউ গুলি দুই পাশে রাখিয়া কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে, মানে মানে সহস্র দু নয়নে শুধু আকাজ্ক্ষা ঢালিয়া চলিয়া যাও।—কিন্তু একটি বার আমায় বলিয়া যাও, তুমি কে? আর বলিয়া যাও, কেমন করিয়া উপরে উঠিলে,—সন্তরণে, না সোপানে, না বেলুনে?

আকাশের সুন্দরী যেন নিরঞ্জনের কাতরতা আর দেখিতে পারিল না, তাই মাথা তুলিল, মৃদু হাসিল, আর তাহার স্বপ্নাশ্লিষ্ট প্রাণকে আকুল করিয়া বলিল,—"সন্তরণে।"

প্রশ্ন। সন্তরণে!

উত্তর। হাঁ সন্তরণে।

প্রশ্ন। সন্তরণে! কি বলিলি অসমসাহসিনি? পড়িয়া যাই-

বার ভয়ে আমি ছাদে উঠি না, আর তুই এত সুন্দর এত কোমল, কোন সাহসে দুইখানি বাহুবল্লীকে পাখা করিয়া, কঠিন সমীরণ ঠেলিয়া, তরতর করিয়া উপরে উঠিলি!—ওখান হইতে পড়িলে কি তুই বাঁচিবি?—ওখানে কেন উঠিয়াছিলি?

উত্তর। তারা খুলে চুলে পরবার জন্য, আর চাঁদের হাসি ছিনাইয়া অষ্ট প্রহর চিবুক দুটিতে মাখিয়া রাখিবার জন্য।

প্রশ্ন। বটে বটে! তবে ত তুই বড় সৌখীন। হাঁ ভাই জলদ-জালিকে! এই দন্তহীন শক্তিহীন প্রবীণ লোকটাকে বিবাহ করিবি?

উত্তর। ক্ষতি কি।

প্রশ্ন। ক্ষতি কি! তবে কি এ তোর রহস্য নয়?

উত্তর। রহস্য করিব কেন, সত্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিব। আমি দিন স্থির করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জনের প্রাণটা স্বপ্নাবেশে যেন খোকা হইয়া গেল, যৌবনের স্মৃতিগুলা তাঁহার যুবজন-যোগ্য প্রশস্ত হৃদয়-প্রান্তরে, এধার হইতে ওধার, ওধার হইতে সেধার গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। নিরঞ্জন পাশ ফিরিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ডুকরিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল, দাঁত উঠিল, চর্ম্ম আঁটিল, চুল কাঁচিল। তাঁহার মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আজীবন হাকিমি করিয়া, মিথ্যা সাক্ষীর জবানবন্দি শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার উন্নত হৃদয়-সৌধের মাথার উপর যে নরজাতির উপর অবিশ্বাসের চারা জন্মিয়াছিল, বয়োধর্ম্মে সে এখন আকাশ-ভেদী হইয়াছে, সে ত আর অট্টালিকা ভূমিসাৎ না করিয়া পড়িবে না। নিরঞ্জন ভাবিল, যে ভীষণ পতনের ভয় না করিয়া

আকাশে উঠিতে পারে, নারী হইয়া উপযাচিকা, পর-প্রেমের জন্য তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস কি? অবিশ্বাস-শার্দ্দূলগ্রস্ত নিরঞ্জন বলিলেন,—"সুন্দরী! তুমি কে?"

সুন্দরী। আমি।

নিরঞ্জন। আমি!—কে তুমি?

সুন্দরী। আমি আমি।

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আমি কথার অর্থ কি?

সুন্দরী। অর্থ—আমি অস্মদ্ শব্দের উত্তম পুরুষের এক বচন।

অভিমানই নিরঞ্জনের এক মাত্র সম্বল। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্ম অর্থ প্রেম এ সকলের অস্তিত্বও বিসর্জ্জন দিতে পারেন, যদি কেহ তার অভিমানের ঘরে অনধিকারপ্রবেশ করে।

নিরঞ্জন বলিলেন—উত্তম পুরুষের এক বচন আমি জানি। কিন্তু এ জগতে উত্তম পুরুষ কই? সব অধম সব পাষণ্ড সব ভণ্ড, কিন্তু তুমি ত পুরুষ নও। সুন্দরী, তুমি যে নারী! তোমার এক বচনে আমি বিশ্বাস করি না। সত্য করিয়া বল তুমি কে?

সুন্দরী। আমি বিষাদ।

সমীরণ অতি ধীরে বীণার সুর-মাখা এই "বিষাদ" কথাটি নিরঞ্জনের শ্রবণ-পথ দিয়া তন্দ্রার কাছে লইয়া চলিল। তার কোমল স্পর্শে তন্দ্রা ঘুমাইল। নিরঞ্জন চোখ মেলিয়া দেখিলেন,—কাননিকা। চোখ মুছিলেন। মুছিয়া দেখিলেন কাননিকা। আবার মুছিলেন। আবার দেখিলেন কাননিকা। তখন মুখ ফিরাইয়া চারি ধারে চাহিলেন—দেখিলেন কাননিকার পত্রিকা।

কাননিকা নিরঞ্জনকে নিদ্রোত্থিত দেখিয়া একটু মধুর স্বর কণ্ঠ-ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দাদা আহারের সমস্ত উদ্যোগ। চাকরেরা আপনাকে ঘুমাইতে দেখিয়া উঠাইতে সাহস করে নাই। মা মাসী ইহারাও ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাই আমি ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছি। এমন অসময়ে ঘুমাইলে কেন দাদা ?"

নিরঞ্জন নিদ্রা-জনয়িত্রী পত্রিকার কথা উল্লেখ করিলেন না। বলিলেন "চল্ যাই ! কিন্তু—"

কাননিকা। কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন ?

নিরঞ্জন। কিছু নয়, চল্ যাই।

কাননিকা। না দাদা, তুমি যেন কিছু বলিতেছিলে।

নিরঞ্জন। কিছু নয়—চল্—বেলা হইয়া গেল।

কাননিকা। নিশ্চয়ই কিছু।

নিরঞ্জন। কখনই নয়।

কাননিকা। অতি অবশ্যই কিছু। কিন্তুর পূর্ব্বে ক্রিয়া সমাপিকা হয় না।

নিরঞ্জন। ওরে আমার ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। তোর ক্রিয়ার হউক না হউক, এখনি আমার প্রাণের সমাপিকা হইবে। কাননিকা দাদার হাত ধরিল। দাদা দেখিলেন—সর্ব্বনাশী কানি বুঝি আবার বায়না ধরে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি ব্যাপার বিষম হইল ! "কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই"—এই কথাটি বলিতে যাইতেছিলেন। 'কিন্তু'র পর এত

বাদ প্রতিবাদ হইয়া গেল। এখন ক্ষুধা নাই বলিলে কি আর বালিকা বিশ্বাস করিবে!—তাই যে কোন প্রকারে হউক বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"কিন্তু একটি কথা না বলিলে, আমি কিছুই আহার করিব না।"

কাননিকা। কি কথা বল!

নিরঞ্জন। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

কাননিকা। আকাশে—বলিয়াই কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। সে এতক্ষণ যে ঘুমন্ত দাদার সঙ্গে কথা কহিতেছিল!

জাগ্রত দাদার কিন্তু মুখ গম্ভীর হইল।—স্বপ্নদৃষ্ট ছবিটে যেন আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সে ছবির সঙ্গে কাননিকার সম্বন্ধ কি!—নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতিকা ছবি কাননিকার সৌন্দর্য্যটুকু অবিকল নকল করিয়াছে, সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই কপোলস্পর্শী অলকগুচ্ছ, সেই নিতম্ব-বিলম্বী কুন্তল, আর সেই হৃদয়দেশে আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবকারিণী চিবুকরঞ্জিনী হাসি। নিরঞ্জন ভাবিলেন, এখনও কি আমার স্বপ্ন? অথবা সে সময়ই আমি জাগ্রত!—তখন সমস্ত সংসার তাহার চোখে স্বপ্নময় ঠেকিল। সেই চক্ষে—সেই স্বপ্নজালাবৃত নয়নতারকায় স্বপ্নময়ীর একটা ফটো উঠিল। সমীরণে ভাসমানা ছায়াময়ী স্বপ্নময়ীর গায়ে লাগিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। যেন মালতী মাধবী জড়াইল। "দূর ছাই, আর আমি এখানে থাকিব না" বলিয়াই নিরঞ্জন মুখ ফিরাইলেন। কাননিকার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"তুই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলি?"

কাননিকা। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

নিরঞ্জন। হা কাননি!—

কাননিকা। কি—

নিরঞ্জন। দেখ্ কাননি!

কাননিকা। কি দেখব?

নিরঞ্জন। শোন্ কাননি দিদিমণি!

কাননিকা। কি শুনব?

"না কিছু য়ন" বলিয়া নিরঞ্জন চলিলেন। কাননিকা দাদার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুক্ষণ গমনোন্মুখ দাদাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, দাদা ভোজনগৃহে না গিয়া অন্যত্র চলিল। তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও?"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন না, আপনার মনেই চলিলেন। কাননিকা বিস্মিতা। দাদার ভাব দেখিয়া সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। মুখ তার কাঁদ কাঁদ হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিল, কণ্ঠ বাষ্প-গদ-গদ হইল—কথা কহিতে কহিতে কহিতে পারিল না। তখন আপনার মনে অন্য দিকে চলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দাদা ভৃত্য বটুকভৈরবকে মারিতেছে। ভৃত্য কপালে করাঘাত করিতেছে, আর আকাশ দেখাইতেছে।

নিরঞ্জন বরাবর বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, বটুকভৈরব আপনার মনে একটি থামের ধারে বসিয়া মাথা নাড়িতেছে, আর বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। নিরঞ্জন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকভৈরব নিরঞ্জনের শ্বশুরের আমলের চাকর। সে ভামিনীর মা, ভামিনী ও ভামিনীর মেয়ে,—এই তিন পুরুষকে মানুষ করিয়াছে।

এখন সেই মেয়ের একটি মেয়ে মানুষ করিবার আশায় বসিয়া আছে। মরিয়া সুখ পাইবে না বলিয়া বৃদ্ধ বটুক মরিতে পারিতেছে না! এক ক্রমে চারি কুড়ি বৎসর অতিক্রম করিয়াও বৃদ্ধ, কাননিকার কন্যা দেখিবার প্রত্যাশায় আজও পর্য্যন্ত তিন জনের ভাত খায়। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি তাহার আশা পূরিল না। বৃদ্ধের বুঝি শেষে স্বর্গে বাতি দেওয়া দেখা হইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, নাত্নীর নাত্নী দেখিতে পাইলেই, তাহার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিবে। বৃদ্ধ তাহাতে চাপিয়া কলিকাতায় গ্যাসের আলোর মত, স্বর্গে যাইবার পথে কেবল চারি ধারে সারি সারি বাতির আলো দেখিবে। কিন্তু তাহা আর হইল কই? কাল যে বৃদ্ধ কেবল মাত্র দুই জনের অন্ন খাইয়াছে। আহার কমিলে আর কেমন করিয়া বাঁচিবে! সেনকুলের মঙ্গলার্থী বটুকের উপর এ শক্রতা কে সাধিল? আর কে? —সে নিরঞ্জন। কোথা হইতে সর্ব্বনেশে নিরঞ্জন আসিয়া এমন সোণার বাড়ীতে আগুণ লাগাইল। মেয়েগুলাকে নির্লজ্জা করিল, তাহারা ঘোমটা ছাড়িল, গাউন ধরিল। জামাইগুলা সলজ্জ হইল, কাণ মলিল, আর যার যেথানে দুচোক যায়, চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! এ আবার কি রকম হইল! সোণার চাঁপা পূজায় লাগিল না, ঘরে পড়িয়া শুকাইল! 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়!'—নিরঞ্জন করিলে কি? মনের দুঃখে মেয়েটা কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না। তাহার কাছে আর আসে না। আসে ত বসে না, বসে ত হাসে না। বটু দাদা বলিয়া ডাকে না, কেবল আকাশ পানে চাহিয়া থাকে, আর কাগজে কি হিজি বিজি লেখে। নিরঞ্জন তোমার মনে এই ছিল! বটুক ভৈরব বসিয়া

বসিয়া মাথা নাড়িতেছিল, আর কেবল নিরঞ্জনকে গালি পাড়িতেছিল। নিরঞ্জন পশ্চাৎ হইতে তার দুই একটি বাক্য শুনিলেন, আর জ্বলিলেন। কিন্তু বহুকালের চাকর বলিয়া তাহাকে কিছুই না বলিয়া কেবল কাছে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটি ঠেলা দিলেন। বলিলেন, "বুড়া কি বলিতেছিস্?"

বটুক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—নিরঞ্জন। দেখিবামাত্রই তাহার সকল দুঃখ একেবারে জাগিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইয়া বলিল, "অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আর মরণ কামনা করিতেছি।"

মিথ্যা কথায় নিরঞ্জনের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডাকিল। বলিলেন—"রে পাষণ্ড বটা, আমি আজ চল্লিশ বৎসর কাল মানুষের জবানবন্দি লইয়া আসিতেছি, তুই আমাকে মিথ্যা বলিয়া পার পাইবি!" এই বলিয়াই যাহা কখন করেন নাই, তাই করিলেন। তাঁহার কাছে রামা দামা হরে শঙ্করা চাকরেরা প্রহার খাইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ বটুক একটি ক্রোধের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পায় নাই। তিনি জীবনে আজ প্রথম বটুককে প্রহার করিলেন।

আজ মনিব-চরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে একেবারেই ভাবিল, তার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য তার কোনও দুঃখ ছিল না, দুঃখ হইল মনিবের জন্য। তাই মনিবের মুখ পানে চাহিয়া একটিও কথা না কহিয়া আবার কপালে করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইল। মনে মনে যেন বলিল "ভগবান! মনিবকে শেষ কালে পাগল করিলে!"

কাননিকা উপর হইতে দাদার আচরণ দেখিয়া, ছুটিয়া বাড়ীতে বলিতে গেল। বটুক ভৈরব ধাবমানা বালিকাকে দেখিয়া

বুঝিল, মেয়েটাও বুঝি ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইল! বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"কানু! ভয় নাই, ভাবিস্ না, আমি নিজে তোর পাত্র আনিয়া দিতেছি। তোর দাদার বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে।" কাননিকা ভাল শুনিতে পাইল না, মনে করিল, বটুক বুঝি প্রহারযাতনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রত্যুত্তরে বলিল,—"ভয় নাই! আমি দাদার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য জল আনিতেছি!"

নিরঞ্জন এ সকল কথায় কাণ দিলেন না। বজ্রগম্ভীর নাদে বটুককে বলিলেন,—"যা—বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। অসভ্য মূর্খ নীচ, আদর পাইয়া মাথায় উঠিয়াছিস্! জানিস্, এখনি আমি তোরে জেল খাটাইতে পারি। তুই আমার খাইয়া আমারেই গালাগাল দিতেছিস্!"

বটুকও তেজস্বী। সে আজীবন প্রভু-পরিবারের জন্য প্রাণ ঢালিয়া আসিতেছে। সে দুই একটা তীব্র কথায় আত্মহারা হইবে কেন?—সেও উত্তর দিল,—"হইয়াছে কি—আরও গালি দিব। যতই কানু বড় হইবে, আমার গালাগালের মাত্রা ততই চড়িবে।"

নিরঞ্জন বটুককে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। এখনও আবার তেজোগর্ভ প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও বৃদ্ধের মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"আমি যদি কাননির বিবাহ না দিই?"

বটুক। কেন দিবে না। তুমি বাবু বিবাহ করিয়াছ কেন?

নিরঞ্জন। সে আমি ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ভাল বুঝিয়াছি, কাননিকাকে কুমারী রাখিয়াছি। হতভাগা মূর্খ চুপ রহ।

আর যদি কথা কহ, তা হইলে একেবারে ফাঁসী-কাটে লটকাইয়া দিব।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না।—কেবল যাইতে যাইতে একবার মাত্র ফিরিয়া বটুককে বলিলেন, "খবরদার!"

নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে বটুকের আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে আবার ফিরিলেন। দেখিলেন, বটুক আবার বসিয়া গালে হাত দিয়াছে। তা হইলে ত নিশ্চয়ই আবার তাঁহাকে গালাগালি দিবার গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতেছে। তা হইলে ত রীতিমত শিক্ষা দেওয়া চাইই চাই! কিন্তু এবারে আর প্রহার কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের আদেশ মত কার্য্যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এবারে সদুপদেশ দানে তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ব্বল বুদ্ধিকে সবল করিতে হইবে। নিরঞ্জন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আবার বটুকের কাছে আসিতে লাগিলেন। বটুক বুঝিল, এবারেও তাহার অদৃষ্টে প্রহার আছে। সে পিঠ পাতিয়া মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন নিকটে আসিয়া ব্যাকরণ-শুদ্ধ গালাগালির সাহায্যে প্রথমে তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন।—"ওরে যৌবন-সীমার পারগামী, হতভাগ্য বটা!" বটা মুখ তুলিল না। "ওরে লোলাঙ্গ শক্তিহীন বুদ্ধিহীন, শুভাশুভাবধারণাক্ষম, বটা!"—বটা হাঁটুর ভিতরে মুখ লুকাইল। "ওরে পাষণ্ড, নির্ম্মম, একগুঁয়ে, অপদার্থ অচেতন অনর্থকারণ বটা!" বটা মুখ থুবড়িয়া শুইয়া পড়িল। তখন নিরুপায় হইয়া নিরঞ্জন, তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাতটি রাখিলেন, মুখ নাবাইয়া তাহার মুখটির কাছে লইয়া

বলিলেন—"দেখ বটু!" বটু চক্ষু মুদিল। "দেখ প্রভুর মঙ্গলানুধ্যায়ী, কাননিকার তিন পুরুষের শরীর-রক্ষী, কিন্তু বিনাপরাধ-দণ্ডিত, সুতরাং লজ্জায় অর্দ্ধমৃত বটুকভৈরব! আমাকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া ক্রোধের বশে তোমাকে প্রহার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা করিয়া বল, বালিকা বয়সে বিবাহ দিয়া কি কাননিকার জীবনটা অশান্তিময় করিয়া তুলিব!" বটুক-ভৈরবের চক্ষু কপালে উঠিল।

"বাল্যবিবাহে ভারতবর্ষ ছারে খারে গিয়াছে ও যাইতেছে। বাল্যবিবাহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছে, লঙ্কায় বানরের উৎপাত হইয়াছে। বাল্যবিবাহে দেশ দরিদ্র হইতেছে, বৎসর বৎসর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, বৎসর বৎসর অনাবৃষ্টিতে শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, বৎসর বৎসর স্বর্ণ-গর্ভা ভারতের শস্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।" বটুকের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের সুর ক্রমে তারা উদারা মুদারায়—গ্রামে গ্রামে উঠা নামা করিতে লাগিল। "শোন্ বটুকভৈরব! বিশেষ প্রয়োজন না দেখিলে, সহজে আমি কাননিকার বিবাহ দিতেছি না।" বটুকের শিব-চক্ষু হইল।

"কাননিকা শুদ্ধ আকাশে উঠিয়াছে। আকাশে ত আজকাল অনেকে উঠিতেছে! কিন্তু সেখানে থাকিবার স্থান কই? কত লোকে যে বেলুনে করিয়া উপরে উঠিল, থাকিতে পারিল কি? নামিতে হইল। প্যারাশুট ধরিয়া পাখী হইল, কিন্তু সুড় সুড় করিয়া সকলকেই নামিতে হইল। তবে যেদিন কাননিকা তারা হইয়া নীলাকাশে চাঁদের পাশে ঘর বাঁধিবে, আর সেখানে

যৌবনশ্রী বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিবে, সেই দিন তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া নামাইয়া আনিব। নতুবা তাহার কখনই বিবাহ দিব না। বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ, তার দেশের সর্ব্বনাশ করিব না। ভয়? কিন্তু কারে ভয়—হিন্দুসমাজকে? সমাজ ত এখন বেতবন। তাহার ভিতর বড় বড় বাঘ লুকাইয়া আছে, গায়ে কেবল কাঁটা। কিন্তু যে দিকে নোয়াইবে, সেই দিকে নুইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। তবে কাননিকে কুমারী রাখিতে ভয় করিব কেন? ভাই বটুকভৈরব!"—বটুক তিনটি খাপি খাইল।

তবু নিরঞ্জন তাহাকে উপদেশ দিতে ছাড়িল না। "বালিকার এখনও যে তরল প্রাণ। সে প্রাণের একটাও বাঁধা ভাব নাই, স্থিরতা নাই। সে কি করিতেছে, নিজেই জানে না। হাসিতে হয় হাসে, কাঁদিতে হয় কাঁদে, অভিমান করিতে হয়, অভিমান করে, লোকের পানে চাহিতে হয়, চাহিয়া থাকে। তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলে বিবাহ করিবে।"

পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর হুড় হুড় করিয়া জল পড়িল। সম্মুখে বটুকভৈরব মরিয়া আড়ষ্ট হইল। নিরঞ্জন তবু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বলিলেন, "বিবাহ করিতে বলিলে তখনই বিবাহ করিবে! কিন্তু কেন বিবাহ করিবে, কারে বিবাহ করিবে, কত দিনের জন্য বিবাহ করিবে, জানিবে কি? ভাই রে, কাননি যে আজ আমাকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারটা কি জানিলে কি সে আর আমাকে অমন কথা কহিতে পারিত! আহা! সে যে সরলা বালিকা, কোমলা কলিকা, তাহাকে এখনও না খাওয়াইয়া দিলে সে যে খাইতে পারে না রে বটুকভৈরব!"

পশ্চাৎ হইতে কাননিকা তার হাত ধরিল। বলিল, "দাদা! খাইবে চল।" নিরঞ্জন ফিরিলেন। দেখিলেন, পাটে পাটে পাড়ে-ঘেরা-কাপড়-পরা, মাথায় আলবর্ট-কাটা-চুল-ফেরা, মুখে-হাসি-ভরা, পায়ে-বুট, গায়ে-স্থট, কিন্তু কক্ষে-কলসী—আহা আহা কি সুন্দর, কবির চোখের রাঙা ছবি কাননি! নিরঞ্জন তখন দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুধাময় জল ঝরিতেছে। বলিলেন, "একি ভাব দিদিমণি!"

কাননিকা। আর একি ভাব! কার সঙ্গে কথা কহিতেছ? সে কি আর আছে? দাদা সর্ব্বনাশ করিলে,—বক্তৃতাস্ত্রে আমার বটুকভৈরব দাদাকে মারিয়া ফেলিলে!

নিরঞ্জন। কি, বটুক মরিয়া গেল! হাঁরে বটুক তুই মরিলি!

বটুক নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু উত্তর করিল না।

নিরঞ্জন এইবারে বটুককে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, বটুক! কি অপরাধে তুই মরিলি! বটুক তথাপি কথা কহিল না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে পড়িয়া গড়াইয়া গেল।

কাননিকা দাদাকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া, তাঁহাকে লইয়া চলিল! লইয়া স্নান করাইয়া, গা মুছাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া, কাছে বসিয়া আহার করাইল।

ক্রমে বটুকভৈরবের মৃত্যুসংবাদ বাড়ীর মধ্যে প্রচারিত হইল। ভামিনী ও তাহার ভগিনীগণ বটুকভৈরবের জন্য কাঁদিল। কাননিকা কিন্তু হাসিয়া সবাইকে উপদেশ দিল;—

মিছা এ রোদন বাছা, মিছা এ রোদন।
মরণ ত নয় ও যে জীবনধারণ!

জন্মে জন্মে কতবার এসেছ জননী!
তুমি কিছু জাননাক, আমি সব জানি।
ওই যে পড়িয়া আছে বটুকভৈরব,—
হয় ত আছিল এক কুলের গৌরব!
হয় ত তাহার ছিল গোলা-পোরা ধান,
হয় ত তাহার ছিল প্রাণ-ভরা গান;
হয় ত সে পরজন্মে হয়ে যাবে হাতী,
ঘুরিবে সে বনে বনে মদগন্ধে মাতি।
হয় ত তাহার পর হবে জমীদার;
হয় ত জন্মিবে প্রাণে ভালবাসা তার;
আমার মতন এক কুমারী তখন,
হয় ত করিতে পারে তাহারে বরণ;
যেই সেই কুমারীরে বিবাহ করিবে,
অমনি আনন্দরোলে আকাশ পূরিবে।
ওই দেখ হাসে তারা, ওই হাসে রবি;
ওই দেখ হাসিতেছে প্রকৃতির ছবি;
মেঘ হাসে, শিশু হাসে, আর হাসে শশী;
তবে কেন কাঁদিতেছ—মা আর মাসী!

সকলেই প্রবোধ মানিল। আর সেই সময় নিরঞ্জন আসিয়া কাননির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—

অনেকবক্ত্রনয়নামনেকাদ্ভুতদর্শনাম্।
অনেকদিব্যাভরণাং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধাং॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ীং দেবীমনন্তাং বিশ্বতোমুখাম্॥

তখন তাহার মুখে বাগ্দেবী আসিয়া বসিল। সেই মুখ হইতে মুখাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বাহির হইল ;—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রাং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপাং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বরি বিশ্বরূপে ॥

অপরাহ্নে মুর্দ্দাফরাস আসিল। বটুকের দেহ মাথায় করিয়া কলুটোলায় লইয়া গেল। সন্ধ্যায় ডাক্তার আসিল। নিরঞ্জনের গৃহে প্রবেশ করিল। এদিকে ডাক্তারে নিরঞ্জনের নাড়ী টিপিল, ওদিকে ডাক্তার বটুকের শবচ্ছেদ করিল। এদিকে ডাক্তারের পরীক্ষায় স্থির হইল, নিরঞ্জনের ব্যাধি অনামিকা। ওদিকের পরীক্ষায় স্থির হইল, বটুকভৈরব মরিয়াছে। কিন্তু কিসে মরিয়াছে, ব্যাধির নাম কি ? করোণারের জুরীগণ একবাক্যে বলিল—অনামিকা।

অভিসারিকা।

রজনীর প্রথম প্রহর বহিয়া গেল। কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ ধীরে ধীরে আঁধার আবরণ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। হিমশীকর-বাহী সমীরণ ছোট ছোট শ্বেত কুসুমের স্তবক চারি ধারে উড়াইল। তাহারা চাঁদ ধরিতে নীলসাগরে সাঁতার দিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু চাঁদ ত ধরা দেয় না। তাহারা যে দিকে যায়, চাঁদ যে তার বিপরীত দিকে সাঁতার দেয়! শেষে লীলারঙ্গে মাতিয়া তাহারা কখন বা একটি একটি তারা ধরিয়া মাথায় পরিল। কখন বা আপনা আপনি জড়াইল। কেহ বালিকা বেশে অন্য বালিকার চিবুক ধরিল। কেহ মানিনী সাজিয়া, আনতমুখী—ও সখীর প্রবোধবচনে মুখ ফিরাইয়া, অতি রাগে বাঘিনী হইল। সখীও তখন ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষিত সাকাঙ্ক্ষ নায়কের পাশে গিয়া দুঃখের কথা জানাইল। মধ্যভাবে গুড়ং—ন্যায়সূত্রাবলম্বী নায়ক, নায়িকার আশা ছাড়িয়া সখীর সহিত মিলিল। কেহ মালা সাজিয়া উড়িয়া উড়িয়া একটা বানরের গলায় জড়াইল। বানর দুই এক বার তারে সোহাগ করিয়া পরিল, তার পর দাঁতে ছিঁড়িল। ছিন্ন, দলিত ফুলরাশি ঝরিয়া ঝরিয়া মনের দুঃখে মিলাইল।

রজনী সুন্দরী। চাঁদের শোভায়, চন্দ্রিকা-বিধৌত অট্টালিকার অস্পষ্ট কিন্তু সুন্দর আভায় রজনী লাবণ্যময়ী শশিকর কোমল-স্পর্শে নিদ্রালসা বিরলতারকায় ত্যক্তাভরণা রজনী চাঁদ গরবিনী! ফুলে ফুলে সমীরসঞ্চারে, স্নিগ্ধ নীলাম্বরে শতদল-শুভ্র জলদখণ্ডের ইতস্ততঃ সঞ্চরণে রজনী লীলাময়ী।

এমন রজনীতে নিরঞ্জনের নিদ্রা নাই। অনামিকা রোগাক্রান্ত নিরঞ্জনের চোখ হইতে, "ভাবাববোধকলুষা দয়িতার" ন্যায় নিদ্রা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। পলক দিয়া নিদ্রাকে চাপিয়া ধরিবেন স্থির করিলেন, তবুও নিদ্রা ধরা দিল না। রাশি রাশি চিন্তা ঘৃত-ধারার মত তাঁহার জ্বালাময় হৃদয়ে ঝরিল। হৃদয় সহস্র গুণ জ্বলিল। তিনি বারকতক শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিলেন। কিন্তু শয্যা তাঁহাকে রাখিতে চাহিল না। সহস্র সহস্র কণ্টক প্রসব করিয়া নিরঞ্জনকে বিঁধিতে লাগিল। নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলেন। টেবিলে আলো জ্বলিতেছিল। এক খানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যে দুই পাতা তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে অক্ষর নাই। তখন পুস্তক রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া, আলোর দিকে চাহিয়া, বসিয়া রহিলেন।

একটা প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের হাতের উপর আসিয়া পড়িল। সেখানে কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল রহিয়া এক মনে যেন কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সেখান হইতে দীপশিখায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য লণ্ঠনের চারিধারে ঘুরিল। দীপের চারিধারে দুর্ভেদ্য কাচের আবরণ। ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির সাধ্য কি, তাহা ভেদ করিয়া দীপের অঙ্গস্পর্শ করে! তবুও নিরস্ত হইল না। সে কাচ ভাঙিবার জন্য ক্ষুদ্র বলটুকু সেই ক্ষুদ্র দেহের প্রতিঅঙ্গে বাঁধিয়া কাচের উপর পড়িল। কাচের কিছু হইল না, কিন্তু তাহার একটি সূত্রোপম চরণ ভাঙিয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া নিশাচরীর এই অসমসাহস নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হাত দিয়া ধীরে ধীরে তারে সরাইয়া

দিলেন। প্রজাপতি সরিল না। সে আবার ফিরিল। কাচের উপর উঠিল, লণ্ঠনে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে চারি ধারে ঘুরিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, হইল কি? অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, কিন্তু কেবল-সুন্দর প্রজাপতির আজ হইল কি! সকলের প্রিয় প্রজাপতি—প্রকৃতির সাত রাজার ধন মাণিক রতন! তোর প্রাণে এমন বৈরাগ্য আসিল কেন? কবি অক্ষরে, বিলাসী আলপিনে, শিল্পী তুলিতে গাঁথিবার জন্য পাগল। ওই অতটুকু অঙ্গ—রামধনু ছাঁকিয়া প্রকৃতি সুন্দরী নির্জনে বসিয়া তোর যে অঙ্গে রঙ ফলাইয়াছে—সেই অঙ্গ আগুনে সঁপিতে কেন প্রজাপতি তুই উন্মাদের মত ঘুরিতেছিস্? রবি ছায়া মাখিয়া তোর গায় কিরণ দেয়, পাছে তার উত্তাপে তোর সোণার অঙ্গ গলিয়া যায়! সমীরণ ভয়ে ভয়ে নাচায়, পাছে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আঁকা, পুষ্পরেণু-মাখা পাখা দু'খানি জোর বাতাসে ভাঙিয়া যায়! ফুল তোরে দেখিলে দুলে। সমীরসঞ্চারী জীবন কুসুম! সে যে তোরে দেখিলে, তার যথাসর্ব্বস্ব বিনামূল্যে তোর পায় ঢালিয়া দেয়! তোর মত উড়িতে পায় না, তাই না সে তোর অদর্শনে সকল হাসি সকল সাধ পবন-সাগরে ঢালিয়া মলিন হইয়া লতাবাঁধনেই ঝরিয়া যায়। সরসী তোরে দেখিলে তরঙ্গকর দোলাইয়া দোলাইয়া ধরিতে আসে! তার হৃদয়শোভাকরী মৃণালিনী পাতায় যে তোরে ঢাকিয়া রাখে, আকাশের মুখ যে দেখিতে দেয় না! নিশায় তোরে পায় না, তাই না সে মনের দুঃখে কমলিনীর মুখ খুলিতে দেয় না। এমন তুই—সবার আদরের প্রজাপতি—তুই আগুণের মুখে মরিতে আসিলি কেন? তোর যদি মরিবার

এত সাধ, তবে এ সংসারে আমরা কি করিব—কার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তোরও যদি সুখ নাই, তবে এ সংসারে সুখ কোথায়?

প্রজাপতি বৃদ্ধের কথায় কাণ দিল না—আপন মনেই ঘুরিতে লাগিল। নিরঞ্জন তখন তাহাকে ধরিলেন, আর লণ্ঠন খুলিয়া "তবে মর!" বলিয়া দীপশিখায় সমর্পণ করিলেন। তার মরিবার সাধ মিটাইলেন।—তার পর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চাঁদ। দেখিলেন, তার পাশে অনন্ত আকাশ। আকাশের গায় নক্ষত্র, নক্ষত্রের পাশে আবার আকাশ। আর দেখিলেন, চাঁদের পাশে, তারার পাশে, নীল আকাশে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র জলদখণ্ড। দেখিয়া কিন্তু নিরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না। এ নিশায় নিরঞ্জনের জাগিয়া লাভ কি! সে কেন জাগিবে, যে আজীবন অন্ধনয়নে দিবারাত্রি সমান দেখিয়া, কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। সে জাগুক,—আজ প্রথম যার চোখ ফুটিয়াছে। সে কেন জাগিবে,—আজীবন প্রবাসে কাল কাটাইয়া, জীবন মরণকে যে সমান করিয়াছে। সে জাগুক, যে বহুদিনব্যাপী বিরহের পর আজ সর্ব্বপ্রথম জীবনে সব পাইয়াছে। সে কেন জাগিবে, যার চাঁদের সহিত তুলনা করিবার কিছু নাই। যার কৌমুদী ধরিবার ভাণ্ড নাই, চাঁদ ধরিবার ফাঁদ নাই, দিবানিশি অন্তরে অন্তরে অতলস্পর্শ জলের ভিতর ডুবিতেছে, তার অগ্রগমন কেবল গভীর হইতে গভীরতর জলে আত্মনিক্ষেপ। সেখানে চাঁদ কোথায়?—

সৌন্দর্য্যে নিরঞ্জনকে টানিতে পারিল না। নিরঞ্জন ক্ষণপূর্ব্বেই যে অতিসুন্দর প্রজাপতিকে অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

চাঁদ দূর হইতেই সুন্দর। বিজ্ঞানে বলে, চাঁদের হাসি বিভীষিকার তুলিতে অঙ্কিত। চাঁদে হৃদয় নাই—প্রাণ নাই। মরুভূমির মত দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে। আমরা চাঁদের কেবল এক দিক দেখিতেছি। অপর দিক আজীবন আমাদের নয়নের অন্তরালে। শুধু মুখের হাসি দেখিয়া, তার অস্তিত্বের সার্থকতা না বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যাইব কেন?

নিরঞ্জন মাথা নামাইলেন। ছাদের উপর অবনতমস্তকে কিছু ক্ষণ পাদচারণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—নিরীহ প্রজাপতিই যখন আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন আমার হৃদয় আমার কাছে রাখিব। কাহারেও প্ররোচনায় হৃদয়টাকে হাতছাড়া করিব না। প্রজাপতি! তোরে যে মারিয়াছি, সে অনেক দুঃখে। তুই এত রাত্রে আমার গৃহে আসিলি কেন? "বিবাহে চ প্রজাপতিঃ।" আমার ঘরে অনূঢ়া কাননি রহিয়াছে। সে নাবালিকা কি সাবালিকা, চারি দিকে তর্ক উঠিয়াছে। সেই তর্কের আঘাতে বৃদ্ধ বটুক মরিয়াছে। কানুর হাত দু'খানি পাইবার জন্য চারি দিক হইতে আমার গৃহে পত্রবৃষ্টি হইতেছে। আমি কোনও রকমে তাহাকে মিষ্ট বচনে, আদরে, যত্নে, বিস্মৃতির কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছি। সে একবার জাগিলে কি আর রক্ষা রাখিবে? যখন সে বুঝিবে, তার নাবালিকাত্ব ঘুচিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিব? সে যে তখন ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন একরকম হইয়া যাইবে! তখন এ দেশের দুঃখ দূর করিব কেমন করিয়া! পাপিষ্ঠ প্রজাপতি! তুই আমার ঘরে না আসিয়া যদি কাননিরই ঘরে প্রবেশ করিতিস্, যদি সে তোরে দেখিতে পাইত,

আর বুঝিত, বিবাহের সম্বন্ধের সঙ্গেই প্রজাপতির সম্বন্ধ, তা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত বল্ দেখি! বেশ করিয়াছি, তোরে মারিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া নিরঞ্জন বিশ পঁচিশ বার ছাদের এধার ওধার করিলেন। তার পর ভাবিলেন—আহা আমার নাতিনীর এতক্ষণ এক ঘুম হইয়া গেল। হয় ত একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া এত ক্ষণ আবার নূতন ঘুমের বন্দোবস্ত করিল। ঘুমন্ত কাননিকাকে একবার দেখিয়া আসিব কি? যাই, ঘুমাইলে সে কেমন সুন্দর হইলে একবার দেখিয়া আসি।

কাননিকার গৃহপার্শ্বে গিয়া, জানালা দিয়া দেখেন, কাননির দুগ্ধফেননিভ শয্যা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বুঝি কাননির দুগ্ধফেননিভ অঙ্গ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন শয্যার উপর শার্দ্দূলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, চাঁদের কিরণ জানালা দিয়া পশিয়া শয্যার উপর ঢেউ খেলিতেছে। কিন্তু কোথায় কাননিকা? ওই যে দুইটা মশক, কানু যেখানে চরণ রাখে, সেই বালিশে গুণ গুণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছে, আর উড়িতেছে। ওই যে দুইটি ছারপোকা, যেন কার অদর্শনে পাগলের মত শয্যার এ পাশ ও পাশ করিতেছে! ওই যে দুইটি কানুকবরীপরিত্যক্ত ফুল, কাণের দুল হইবার জন্য কাননির শ্রবণস্পর্শসুখালস বালিশের পানে বিরসবদনে চাহিয়া আছে। সব আছে,—কাননিকা কোথায়? ঘর আছে, পালঙ্ক আছে, শয্যা আছে, কাননি কোথায়? আমার চক্ষু আছে, চক্ষের জ্যোতি আছে, বাহিরে আলো আছে, ঘরের আলো কানু কোথায়? নিরঞ্জন অগ্রসর হইলেন। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা। ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, টেবিলের

উপর চারি ধারে সুশৃঙ্খলাবিন্যস্ত পুস্তক। সেই পুস্তকপ্রাচীর-মধ্যে শ্যামলপ্রান্তরবৎ সুন্দর টেবিল-হৃদয়ে শুভ্রচূড় শ্যামসুন্দর ল্যাম্পতরু; তৎপার্শ্বে কুসুমাধার, লতারূপিণী ভেস (vase); ভেসের পার্শ্বে টবরূপী দোয়াত। দোয়াতে কালি, কালিতে কলম। যেন কালীয়হ্রদের ফণাধর, কৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষায় মাথা তুলিয়া ঈষৎ ঈষৎ দুলিতেছে। সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর টেবিলটি নিরঞ্জনের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মত বোধ হইল। নিরঞ্জন তাহাতে যেন গাছ পালা লতা গুল্ম দিঘী সরোবর সব দেখিলেন;—কিন্তু মানুষ দেখিলেন না। তাঁহার পলে পলে নেশা হইতে লাগিল, পলে পলে নেশা ভাঙ্গিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, কানু বুঝি এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া, পুষ্পরেণু গায়ে মাখিয়া বেণু বাজাইয়া ধেনু চরাইতেছে। আবার ভাবিলেন, না, কাননি যে আমার নাতিনী!

কিন্তু কাননি কোথায়? কৌমুদী গালিচার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে, কাননির রাঙা পা দুখানি স্পর্শ করিবে বলিয়া। কিন্তু সে চরণ কই? ফুলমালা রেকাবে পড়িয়া শুকাইতেছে, এ মালার গলা কই? আহা হা! ক্ষুণ্ণমনে এককোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া ওই যে কানুর মেনু রহিয়াছে। কিন্তু মেনুর কানু কই?

নিরঞ্জন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, মেয়েকে 'নিশি'তে লইয়া গিয়াছে। কি করেন, ঘরে ফিরিয়া শয়ন করিলেন। কানুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশে দেখিতে পাইলেন, যেন আরব্য-উপন্যাসের একটা দৈত্য স্বন্ স্বন্ করিয়া তাঁহার বাড়ীর মাথার উপর উড়িতেছে। উড়িতে উড়িতে ছোঁ মারিল, আর

"ছোঁ"-এর সঙ্গে তাঁহার কাননিকা উড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, দৈত্যটাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশকে হুকুম দিই। তাহারা শূন্যমার্গে ওয়ারেণ্ট উড়াইয়া দিক্। পুলিসের ওয়ারেণ্টের কাছে কার নিস্তার আছে? সে জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে, আর আকাশে উড়িয়া দৈত্য ধরিতে পারে না!

দৈত্যরাজ কাননিকে ধরিয়া ঈগল পক্ষীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিল। তার বাহু-অর্গলাবদ্ধ হৃদয়গুহাশ্রিতা কাননিকা এখনও ঘুমঘোরে অচেতনা। কমলপত্রাক্ষীর নিমীলিত নয়নযুগলে গুচ্ছে গুচ্ছে অলক পড়িয়াছে। গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া আধআঁধার আধ-কৌমুদীমাখা চাঁদমুখখানি দৈত্যের বাহুর উপর ভর দিয়া রাখিয়াছে। সঞ্চারকম্পনে শিথিলীকৃতা কবরীর কেশরাশি, ধীর-চুম্বিত হইয়া উড়িতেছে; কখন বা গণ্ডে পড়িতেছে, কখন বা দৈত্যের শ্রমস্বেদনিষিক্ত মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি তারা খসিয়া তার কপালে লাগিয়া টীপ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুই একটি শ্বেত খণ্ডমেঘ তার কাঁধে পড়িয়া ওড়না হইল। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি চাঁদের কর তার চিবুকে পড়িয়া জড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যবর সমীরণের সঙ্গীত ঠেলিয়া, মেঘের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া, বহু দূর চলিল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ধূসর গিরিশ্রেণী, শ্যাম কান্তার, নীলজল, শ্বেত সৌধমালা, দিগন্তবিস্তৃত আরব্যদেশের মরুপ্রান্তর, গগনস্পর্শী, হৈমচূড়, কালিফের ভুবনমোহিনী বেগমকুল-নিষেবিতা বোগদাদ—সকলের উপরের আকাশ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া দৈত্যরাজ তাহার আদরের কাননিকে কোন দূরদেশের অচল উদ্দেশে লইয়া চলিল। নিরঞ্জন

কানুর অদর্শন সহিত পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষণ্ড দৈত্যাধম! দে আমার কানুধন ফিরাইয়া দে।" দৈত্য কি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তুচ্ছ নিরঞ্জনের কথা শুনে! সে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন নিরঞ্জন দৈত্যকে ধরিবার জন্য নিজে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। দুই একবার গা ঝাঁকারিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরটা পতঙ্গদেহবৎ লঘু হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঘর ছাড়িয়া নিরঞ্জন দ্বিতল ত্রিতল উঠিয়া উঠিয়া অভ্র ভেদিয়া ধূমকেতু হইতে যাইতেছেন, এমন সময় ধরণীপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল,— "দাদা!" নিরঞ্জন মুখ নামাইয়া দেখিলেন, একটি শৈলকন্দরে, একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে, একটি শৈবলিনীর জলকল্লোল-কোলাহলের আবরণে বসিয়া, রাহুভয়ে ভূতলাবতীর্ণ নিশামণির মত কাননি আপনার মনে গান গাহিতেছে ;—

"আমার মন ভুলালে যে কোথায় থাকে সে!
সে দেখে আমি দেখি না রয়েছে আশে পাশে।
বলরে তরু বলরে লতা,
আমার হৃদয়মোহন আছে কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে।"

নিরঞ্জন, "ভয় নাই, ভয় নাই!" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নামিয়া আসিলেন। কাননিকা দাদাকে সেই নিভৃতদেশে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল,—"দাদা!"

নিরঞ্জন চক্ষু মেলিয়া দেখেন, যথার্থই কাননিকা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, দাদা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। স্বপ্নে তাহাকে

যেমনটি দেখিয়াছিলেন, ঘুমবিজড়িত চক্ষে তিনি সেই কাননিকে সহস্র গুণ সুন্দর দেখিলেন! বলিলেন, "কি দিদিমণি!"

কাননিকা। আর দিদিমণি!—তুমি স্বপ্নে যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছ, শুনিয়া আমার গা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁ দাদা, তুমি অত স্বপ্ন দেখ কেন?

নিরঞ্জন। আর ভাই, জাগরণে কিছু দেখিতে পাই না, কাজেই স্বপ্নে দেখিতে হয়। দেখিতে না পাইলে কেমন করিয়া বাঁচিব বল্।

কাননিকা। তা দেখ। কিন্তু তোমার দেখার দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায়!—এই দেখ, এখনও আমার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিতেছে।

নিরঞ্জন, যেন কাননিকার বিষয় কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিস্ কি! ঘুমন্তে এমন চীৎকার করিয়াছি যে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল?"

কাননিকার হাত দুখানি দুটি স্বরচিত কবিতা ধরিয়া আবদ্ধ ছিল। অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সমীরণ তাহার অধরোষ্ঠের সুরভি ঘ্রাণ লাভের জন্য চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। কেশের এ বেয়াদপি তাহার সহ্য হইল না। তাই সে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য বল প্রয়োগ আরম্ভ করিল। তাহারা ভয়ে তাহার তিলফুল-নাসায় জড়াইল। কাননিকা গ্রীবাভঙ্গে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে সংন্যস্ত করিতে গেল। বিপরীত ফল হইল। পৃষ্ঠদেশ হইতে আরও কতকগুলি কেশ আসিয়া তার মুখ চোখ কপোলগণ্ড একেবারে ঢাকিয়া ফেলিলে, কাননিকা বলিল, "দাদা চুলগুলা মুখ হইতে সরাইয়া দাও ত!" আগে শশী পিছে আঁধিয়ার ছিল। এখন আঁধিয়ার শশীর অঙ্গে

পড়িয়া তাহাকে খণ্ডখণ্ড করিল। অগণ্য তড়িত-লতার স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ সেই গৃহটাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। নিরঞ্জন কাননিকার সে মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না; তিনি আরও অধিকক্ষণ দেখিবেন বলিয়া নাতিনীকে বলিলেন, "নাতিনি! জলধর-অঙ্গে শতধা বিভক্ত চাঁদ দামিনী হইয়া জলদে ভাসিয়া পলকে পলকে চলিয়া যায়। তোর মুখে যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে! আমি তোর চুল সরাইব না।"

কাননিকা তখন বাহুলতা দিয়া কোনও রকমে কেশপাশ পৃষ্ঠে ফেলিয়া বলিল, "তুমি কি বলিতেছিলে!"

নিরঞ্জন। আমার চীৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল!

কাননিকা। সে ত বুঝিতেই পারিতেছ!—দেখ দেখি, আমার মুখে এখনও কি ঘুম জড়াইয়া আছে।

নিরঞ্জন। তোর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ঘুম আজ তিন দিন তোর চোখের ধার দিয়া যায় নাই।

কাননিকা দাদার কথায় সাত সুরে যুগপৎ ঝঙ্কার মারিয়া হাসিল। আর বলিল, "এত বোধশক্তি না থাকিলে তোমাকে হাকিম বলিবে কেন? কিন্তু তোমাদের হাকিম জাতি যে চোখ মেলিয়া ঘুমায়! আমি চাহিয়া আছি বলিয়া, আমার নিদ্রায় তোমার বিশ্বাস হইল না?"

নিরঞ্জন। কি রাক্ষসি! সমাজের মহোপকারী দেশের প্রকৃত হিতৈষী হাকিমকে তুই অস্পর্শীয় রজকভারবাহী একটা অপকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করিলি!—আমি তোর শূন্য ঘরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। তুই কোথায় ছিলি? আর সেথায় কি করিতেছিলি?

কাননিকা। আমি বাগানে গিয়াছিলাম। সেখানে পুষ্করিণীর

সান বাঁধা ঘাটে বসিয়া দুটি চাঁদ দেখিতেছিলাম। তার একটি ছিল নভঃস্থলে, অপরটি সরসীজলে। একটি চলিতেছিল, অপরটি কাঁপিতেছিল। আমি সেই দুই চাঁদের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতেছিলাম, আর ঘুমাইতেছিলাম।

নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই অচ্ছোদসরোবরতীরের পত্র লেখিকা আর কাননির জননী ভামিনী, দুয়ে মিলিয়া কাননি হইয়াছে। তাহারা দুই জনে দুই দিকে চাহিয়াছে, কাননি একাই দু কাজ সারিয়াছে। তা হ'লে ত প্রজাপতি আগুণে পুড়িয়া, দেহদহনজাত গন্ধটা কাননির নাকের কাছে ধরিয়াছে! কাননির বিবাহ ত না দিলে চলে না।

অন্তর্য্যামিনী কাননি নিরঞ্জনের মনের কথা সব শুনিল! উত্তরে বলিল—"দাদা! এমন সোণার চাঁদ থাকিতে, নারীগুলা মানুষ বিবাহ করিয়া মরে কেন?

নিরঞ্জন বলিলেন, "চাঁদকে বিবাহ!—"

কাননিকা। হাঁ, চাঁদকে বিবাহ। চাঁদ যদি নারী পাইত, তাহা হইলে আকাশ ছাড়িত না, কুমুদিনীর রঙ্গস্থলে জলের হিল্লোলে হিল্লোলে আছড়াপিছড়ি খাইত না। অধিক আর কি বলিব, তাহা হইলে নিশায় অমাবস্যা হইত না।

কাননিকার কথা নিরঞ্জনের কাণে কেমন কেমন ঠেকিল। ভাবিলেন, মাতামহকে দেখিয়া নাতিনীর হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই লজ্জার বেলাভূমি ছাড়াইয়া রহস্যটা কিছু বেশী দূর উঠিয়া পড়িয়াছে। নাতিনীর রহস্য-স্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখন একটু ঘুমুগে।"

কাননিকা। নিদ্রা আমি চাঁদকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি।

আমি আজ হইতে আর ঘুমাইব না। কেবল জাগিব। সংসারের সকল নারীর সহিত চাঁদের মিলন ঘটাইয়া, সকলকে কুমারী রাখিয়া কিছু দিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তার পর চাঁদের ঘুম কাড়িয়া অনন্ত নিদ্রার কোলে মাথা রাখিব।

নিরঞ্জন দেখিলেন, কাননিকার চক্ষু জলে পূরিয়াছে। ভাবিলেন, এ কি!—মেয়েটা পাগল হইল নাকি! তখন ভাবিলেন, নারীর হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত কঠোর আদেশে তাহাকে অনূঢ়া রাখিয়া বুঝি পাগল করিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কালই নাতিনীর বর খুঁজিব। কাননিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল্—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। নিশি-জাগরণে অসুখ হইবে।" একটু কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া কহিলেন, "কাঞ্চনময়ি! শ্রীহীনা হইতে তোর এত সাধ কেন? এ কমল-নয়ন চাঁদ দেখিবার জন্য নয়।" এই বলিয়া কাননিকার হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া চলিলেন। কাননিকা কথা কহিল না। নীরবে নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিল।

নিরঞ্জন প্রশ্নে প্রশ্নে আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিম্বা ভামিনী ও অন্যান্য কন্যাগণকে ডাকিয়া, তাহাদিগের কাছে কাননিকার বর্ত্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিয়া সেনগৃহের নিদ্রাকে বনবাসিনী করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল। কাল প্রাতঃকালেই তিনি ঘটক ডাকিয়া, অথবা সহস্র পত্রলেখকের যাহাকে হউক, এক জনকে বাছিয়া, কাননিকার বর নির্দ্দেশ করিবেন।

কাননিকাকে গৃহপ্রবিষ্টা দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

কিন্তু সে নিদ্রা যায় কি না, দেখিবার জন্য ঘরের কানাচে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন, কাননিকা গান ধরিবার ভাঁজ করিতেছে। তার পর শুনিলেন, অতিমধুর অনুচ্চকণ্ঠের গীত।

দাদা! এ নয় কমল-আঁখি।
সুখ সরোবরে ফুটিতে ফুটিতে মুদিবে চাঁদেরে দেখি।
আমি নিশায় কুমুদী হৃদয়ের নদী
শশীর কিরণে ধরে সে টান।
প্রভাত অরুণে পাখীগণ সনে
গাই আগমনী ললিত গান।
আমি সাঁজের গগন-তারা।
আপনার ভাবে আপনি বিভোরা
নীরব আপন-হারা।
কভু ফুটিতে ফুটিতে ফুটি না।
কভু চলিতে চলিতে চলে যাই দূরে,
কারে ফিরে চেয়ে দেখি না।
কভু মেঘের আড়ালে থাকি,
দামিনী লতায় পরিয়া গলায়,
তারি সনে মারি উঁকি।
দাদা! এ নয় কমল-আঁখি।

চিরপ্রবাসীর সহলোদ্দীপ্তা স্বদেশস্মৃতি, পুলিশধৃত নিরপরাধীর কাষ্ঠমঞ্চভীতি, কৃতাপরাধের অনুতাপ, বিয়োগীর স্বপ্নে, চিরলাঞ্ছিতা জীবনে মৃতকল্পা অকালমরণে উজ্জীবিতা প্রিয়ার সকরুণ তিরস্কার, আর স্বপ্নাবিষ্ট কোমল শিশুর "দেয়লা"—সকলে

মিলিয়া পরস্পরের হাতে হাতে ধরিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রাণটা তাঁর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাশি রাশি চক্ষুজলে তিনি সেই নবাগত অতিথিগণের পাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন।

এমন সময় দূর হইতে সঙ্গীত উঠিল ;—

উধাও প্রাণের ঢেউ,
দূর হ'তে দেখ, কাছে নাহি থাক,
ধরিতে যেও না কেউ!
যা'ক সে সাগর পার।
যা'ক কূলে কূলে অনন্তের কূলে,
যথা অভিলাষ তার।
ফুলের উপরে ফুল ঝরে ঝরে
মিনি গাঁথনির মালা।
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিকটে যেও না,
কথা রাখ এই বেলা।

নিরঞ্জন তখন বুঝিলেন, এই দূরের সঙ্গীতটাই কাননিকাকে পাগল করিয়াছে। নৈশগগন ভেদ করিয়া উচ্চগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "দূরের সঙ্গীত!"—উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর আনিল, ইৎ। (১) নিরঞ্জন আবার বলিলেন, "এখনও কোথায় আছিস্ বল্।" প্রতিধ্বনি খল্ খল্ হাসিল।

(১) ইৎ=লোপ। সংস্কৃত ব্যাকরণে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে আর ইতের কথা বলিতে হইবে না। কৃৎ প্রকরণের ক্বিপ্ প্রত্যয়ের সমস্তই ইৎ যায়, কিছুই থাকে না।

রণরণিকা। *

পরদিন সেনগৃহে হুলস্থূল বাধিয়াছে। কাননিকার বিবাহের কথা উঠিয়াছে। নিরঞ্জন বঙ্গ-সমাজের খাতা খুলিয়া বিদুষী কুমারীর আয় ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালায় কুমারী নাই। অনেকেই প্রথম বয়সে বিশ্ববিদ্যার নবোৎসাহে কুমারীর খাতায় নাম লিখিয়াছিল। কিন্তু কেহ তারুণ্য স্রোতে অকূলে পড়িবার ভয়ে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, নরকাষ্ঠে ভর দিয়াছে। কেহ বা কোনও প্রকারে পরপারে পৌছিয়াই, সম্মুখে বার্দ্ধক্যের জলা দেখিয়া, জীবন-পথে একেলা চলিতে সাহস না করিয়া সঙ্গী লইয়াছে। খাতার এক কোণে দু' একটি নাম পড়িয়া আছে; কিন্তু কাননিকা ছাড়া, আর সবার বিবাহ হয় হয়—রয় না। কুমারী আছে খৃষ্টানী, কুমারী আছে বিলাতী রমণী। নিরঞ্জন তাহাদের বিবাহ করিবার সুবিধা দেখিলেন না। বর কই? কাহার কাহার রূপ কই?—

কাননিকার বরে বরে বাঙ্গালা ভরিয়া রহিয়াছে। একটা ঢিল ছুঁড়িলে দুই দশটা বরের মাথা ফাটিয়া যায়। এমন কাননি দ্বিভুজা, হেমগৌরাঙ্গী, বিদ্যাভরণভূষণা, সুচারুদশনা, হরিণনয়না —বিবাহ বিনা তার মন ভাল থাকিবে কেন? নিরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়াছে। রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। মরিতে হইলে, সংসারের উপর প্রভুত্ব রাখিতে পারিবেন না।

---

* রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। বিশ্বাস না হয় অভিধান দেখ।

প্রভুত্ব যাইলে, কেহ তাঁহার কথা রাখিবে না। কথা না থাকিলে, যার যা ইচ্ছা তাই করিবে। যা ইচ্ছা তাই করিলে, দেশটা ছার খার হইয়া যাইবে। ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কাননিকার কুমারীত্বে দেশের যতটুকু উপকার, অন্য দিকে কুমারকুলের মনোভঙ্গে তার চার গুণ অপকার। ব্যারিষ্টার আইনজালে আপনাকে জড়াইবে, ইন্‌জিনিয়র বক্ষ-ক্ষেত্র দিয়া খাল চালাইবে, ডাক্তার নিজের গলায় অস্ত্র বসাইবে, প্রোফেসর আত্মহত্যার লেক্‌চর দিবে, ছাত্র ছাদ হইতে পড়িবে। কাজেই কাননিকার বিবাহ দেওয়া স্থির।

ভামিনী দৌহিত্রের মুখ দেখিতে লালায়িতা, বাপের কাছে আসিয়া কাঁদিল। বাপ আশ্বাস দিলেন, কাননির বিবাহ দিব।

নিরঞ্জন প্রথমে দূরের সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিলেন। চোঙ-দারের কাছে লোক পাঠাইলেন। চোঙদার লিখিল, "চিনি না। তাহাকে একদিন মাত্র তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছিলাম। সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বোধ হয় তাহাকে চিনে।" নিরঞ্জন তাহাদিগের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। তাহারাও উত্তর দিল, "জানি না।" ঈর্ষ্যায় বলিল, কি যথার্থই বলিল, নিরঞ্জন পত্র পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলেন না। "জানি না"র পরে তাহারা কি মাথা মুণ্ড লিখিয়াছে! লিখিতে হাঁত কাঁপিয়াছে বোধ হইল! অক্ষর গুলা জড়াইয়া জাড়াইয়া হাঁড়ি কলসী, সাপ ব্যাঙের আকার ধরিয়াছে। নিরঞ্জন বাড়ীতে সন্ধান করিলেন। এক জন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, দূরের সঙ্গীত চিনিস্‌?" এক জন বলিল, "হাঁ হুজুর চিনি।"

নিরঞ্জন। এই চিঠি তাহাকে দিয়া জবানি লইয়া আয়।

চাকর চিঠি হাতে ছুটিল। নিরঞ্জন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

চাকর কিছুক্ষণ পরেই ফিরিল! হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনিবের হাতে একটা জিনিষ দিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "একি!"

চাকর। আজ্ঞে হুজুর! যবানি। বেণের দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম।

নিরঞ্জন অবাক হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "চিঠিখানা কি করিলি?"

চাকর। চিঠিখানা বেনের হাতে দিলাম। সে ইংরাজীলেখা পড়িতে পারিল না। এক বাবু-খদ্দের দিয়া পড়াইল। বাবু বলিল, "হুজুর তোমাকে পত্রপাঠমাত্র যাইতে লিখিয়াছেন।" "দোকানী বলিল, "এখন আমার ঢের খদ্দের—এখন যাইতে পারিব না, বৈকালে যাইব।" আমি বলিলাম, "তবে জবানি দাও।" সে বলিল, "কয় পয়সার?" হুজুর কিছু বলিয়া দেন নাই বলিয়া, আমি ধার করিয়া এক পয়সার যবানি আনিলাম।

নিরঞ্জন। যবানি ফিরাইয়া দিয়া, আমার চিঠি লইয়া আয়। আসিয়া, এইখানে এক পায়ে এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাক্।

চাকর যবানি লইয়া আবার ছুটিল। নিরঞ্জন দ্বারবানকে দূরের সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল, "লাইব্রেরীতে আছে। সে দিদিবাবুর জন্য অনেক বার তাহা আনিয়াছে।"

নিরঞ্জন মুখ ফিরাইতেছেন, এমন সময় বেনেকে সঙ্গে করিয়া চাকর ফিরিল। বেনে আসিয়া জোড়করে নিরঞ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর! কসুর মাফ্ হয়। আমি বুঝিতে না পারিয়া, সেই চিঠিতে মশলা বাঁধিয়া খদ্দেরকে দিয়াছি।"—নির-

ঞ্জন কথা কহিলেন না, চলিয়া গেলেন। বেনে কপালে হাত দিল, চাকর একপায়ে, দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন আর কোথাও না গিয়া, বরাবর ভামিনীর কাছে গেলেন। বলিলেন, "ভামু! উপায়—দূরের সঙ্গীতের ত সন্ধান পাইলাম না। তাহাকেই আমার পছন্দ। তুই একবার কাননিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্?"

ভামিনী। কেন পারিব না। কিন্তু দূরের সঙ্গীত পদার্থটা কি?

নিরঞ্জন। সে একটি হাস্যময় উদারহৃদয় যুবা। সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ভামিনী। ও বাবা বল কি—দূরের সঙ্গীত মানুষ!—মানুষের কথা আমি কেমন করিয়া কাননির কাছে পাড়িব! সে মানুষের নাম শুনিলেই কাঁদিয়া ফেলিবে। কাঁদিলেই তার মাথা ধরিবে। মাথা ধরিলেই অসুখ করিবে।

নিরঞ্জন। আর অসুখ করিলেই মরিয়া যাইবে। কাল সারা রাত জাগিয়াছে, তার খবর রাখিস্? সে রোগের চেয়ে কি মাথা-ধরা বড়? যা, শিগ্গির যা। দূরের সঙ্গীতের সংবাদ লইয়া আর, আমি কালই কাননির বিবাহ দিব।

ভামিনীর চক্ষু দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। নিশ্বাস দেখিতে দেখিতে দমে দমে বাহির হইতে লাগিল। সে দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে পা ছড়াইল।

নিরঞ্জন দেখিলেন, আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বলি-লেন, "করিস্ কি?"

ভামিনী উত্তর দিল না। মৃতা জননীর উদ্দেশে কাঁদিতে বসিল। "মা গো! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখ্ গো! তোমার

কত আদরের কানু অনাথার মত রাত্তিরে রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায় যে গো! ওগো! তারে দেখে, এমন কেউ নেই যে গো!"

নিরঞ্জন। আরে গেল, কাঁদিতে লাগিলি কেন? আমি তোরে এমন কি কটু কথা বলিয়াছি!

ভামিনী উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতেই লাগিল।—"যে আমার ছিল গো, যার হাতে তুমি দিয়ে গিছলে গো!—সে যে মনের দুঃখে আমায় ফেলে চলে গেছে গো!—মা গো!"

নিরঞ্জন। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

ভামিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি তারে তাড়িয়ে দিলে না ত সে গেল কেন?

নিরঞ্জন। সে ত আপনি চলিয়া গেল, তুই দেখিলি।

ভামিনী। সে আপনি চলিয়া গেল!—আমি তারে দূর দূর করিয়া তাড়াইলে সে নড়িত না—রাগ করিয়া দু' দণ্ড বাহিরে থাকিতে পারিত না।—সে চলিয়া গেল! তুমি যে তার গলা টিপিয়া ধরিলে!—ওগো! মাগো।—আমার সে যে বড় অভিমানে চলে গেছে গো!—সে যে দশ বৎসরে কানুর বে দিতে চেয়েছিল!—ওগো!—মাগো!—তোর অভিমানী জামাই আজ কোথায় গো!—

নিরঞ্জন। আমার মাথায় গো! কেন তুইও ত ছিলি। তুই তখন তাকে ধরে রাখতে পারলিনি। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথা খেতে লাগলি।

ভামিনী। আমার হাত জোড়া ছিল, তাই পারলেম না। আর আমি জানতেম, সে যে ফিরে আসবে গো!—ওগো! মাগো!—

নিরঞ্জন। আবার মাগো? কেন, সে কি তোর তাকে ধরে এনে দেবে না কি?—বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের গলায় করুণরস জমিয়া গেল। সেই রসগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—"আমি সকলের জন্য এত করিলাম, তবু যদি আমার এ লাঞ্ছনা—তবে আমিই বা আর ঘরে থাকি কেন?"

দেখিতে দেখিতে চারি ধার হইতে, রঙ্গিণী যোগিনী কন্যা-দ্বয়, চারণী, বারণী, যামিনী, দামিনী, ঘেনি, পেনি, টুনি, চুনি, নাতিনীগণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জন ও ভামিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া, একেবারেই যেন সব বুঝিল। বুঝিল, কাননি মরিয়াছে। যে যেখানে স্থান পাইল, বসিল; আর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। দিবসেই যেন 'ফেরু পাল কেউ কেউ গভীর ফুকারিল।'—ওগো, মাগো, বাবাগো, দিদিগো,—অ্যাঁ অ্যাঁ, ভ্যাঁ চ্যাঁ—ভৈরব নিনাদে নিরঞ্জনের বাড়ী যেন এক মুহূর্ত্তে শ্মশান হইয়া গেল।—"ওগো! কানু গো! তুই আমাদের ফেলে কোথা গেলি গো!"

কাননিকা তত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল। সেই চীৎকারে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিল। প্রথমে তাহার বোধ হইল, যেন আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে সে বসিয়া আছে। নায়েগ্রার জলপ্রপাত হইতে রাশি রাশি জল পড়িতেছে। বাষ্পে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতেছে।—না, তা ত নয়—এ যে কানু গো—কানু গো—করিতেছে! তখন বলিল, "না ভাই জল প্রপাত! এখন আমি খেলিতে পারিব না।" এই বলিয়া আবার শয়ন করিল।

এদিকে ভামিনীর ভগ্নীসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিল, কাননি মরে নাই। "ষাট্ ষাট্—কানু আমার নীরোগ হইয়া, অখণ্ড পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক্।"—ভামিনী তাহাদের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল, "বাবা যেমন করিয়া পার, আমার একটা উপায় কর।"

নিরঞ্জন বলিলেন—"আয় তবে—দেখি তোর কি উপায় করিতে পারি।—শুধু তোর কেন, একেবারে সব মেয়ের গতি করিব।"

মেয়েরা চলিয়া গেল। নিরঞ্জন মনে মনে বলিলেন,—এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই মহানগরী কলিকাতায় আমি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের অবতারণা করিব! কাননিকাকে স্বয়ম্বরা করিব।

জামাইগণকে সন্ধান করিয়া আনাইলেন। সকলে আসিল। কেবল রমণীচরণের সন্ধান পাওয়া গেল না। নিরঞ্জন উইল করিয়া, সমান সমান ভাগ করিয়া, কন্যাগণকে দিলেন। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা অন্য বাড়ীতে চলিয়া গেল। ভামিনীকে তিনি নিজের বাড়ী দান করিলেন।

ভাণিকা। *

ভাই পাঠক!—কি ভ্রম! পাঠক কোথায়? তাঁহাকে যে কাননিকা কাব্য-কাননে বহু দিন হইল ফেলিয়া আসিয়াছি! সেখানে খর-বেগা কবিতা-নদীর কিনারায় আসিয়া 'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবে পার' হইতে হইবে দেখিয়া, মনের দুঃখে পাঠক-প্রবর মানে মানে গা ঢাকা দিয়াছেন। কোথায় সম্পাদক বঙ্গ ভাষার উন্নতিকল্পে 'গ্রাহক ও অনু-গ্রাহকের প্রতি' নিবেদনাদি প্রবন্ধ লিখিয়া, মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া শয্যায় আড়—বাঙ্গালা বই পড়িবার তার সময় কই? কোথায় দেশহিতব্রতে ব্রতী? দেশবাসীর ঘুম ভাঙাইতে ওয়েবষ্টারের ত্রিশ হাজার পদ যোজনায় বাক্য গড়িয়া জিহ্বায় আনিতে, তার মনের গলাও যে ভাঙিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা পড়িবার উপায় কই? বাকি আছে হতভাগ্য লেখক। সে ত আপনার লেখায় আপনি তন্ময়,—গৃহশোভাকরী স্বরচিত মোহনমালার, কীট মূষিকের অত্যাচারে দিন দিন শ্রীহীনতা দেখিতে দেখিতে মৃণ্ময়—পরের পুস্তকের মলাটের ভিতরে অক্ষর থাকে, সে অক্ষরে আবার চোখ বুলাইতে হয়—তার জ্ঞান কই? রাজা মহারাজার কথা ছাড়িয়া দিই—তারা ত জ্বলজ্জটাকলাপ ভ্রুকুটীকুটিলমুখ দুর্ব্বাসার পিতামহ—দুর্ব্বাসা 'ভস্ম হও' বলিলে অভিশপ্ত ভস্ম হইত। ইহাদের নামটি শুনিলেই স্বরস্বতী জ্বলিয়া যায়। পাঠক হইতে বহুদিন ছাড়াছাড়ি। তবে আমার কাননি-কার কথা শুনিতেছে কে?—

শুনিতেছে সে, যাহার অস্তিত্বে বাঙ্গালার অস্তিত্ব, যাহার

---

* ভাণিকা—এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান দৃশ্যকাব্য।

উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি। যে আছে বলিয়া বাঙ্গালার লেখক আছে। যাহার প্ররোচনায় গুণধর বই কিনে, যাহার উৎসাহে অবসাদকম্পিতাঙ্গ পাঠকের হাত হইতে বাঙ্গালা বই পড়িতে পড়িতে রহিয়া যায়, কান্না আসিতে আসিতে চোখের কোণেই মরিয়া যায়। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মি! কবে তুমি তোমার অভাগিনী ভগ্নীকে তোমার গুণধরের সুনয়নে আনিতে চেষ্টা করিবে? প্রভুর স্বদেশহিতৈষিতায় আমাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই। তার গগনভেদী চীৎকারে শব্দ নাই, তার সাগরলঙ্ঘী উল্লম্ফনে স্পন্দন নাই। তার উৎসাহে কার্য্য নাই, পরোপকারে প্রাণ নাই, ভালবাসায় প্রেম নাই। সে হইতে কখন কোন উপকার হয় নাই, কখন কোন উপকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। হে প্রভুপত্নী, মৃদুহাসিনী, আধভাষিণী মহিমাময়ী পাঠিকে! তোমার করুণা ভিন্ন ভাষার উন্নতি হইতেই পারে না। বাঙ্গালায় দ্বিসপ্ত-কোটী হাত আছে, কিন্তু তাহাতে বই ধরিবার শক্তি নাই। সপ্তকোটী হৃদয় আছে, কিন্তু দুই কি তিন শত ছাড়া আর কোন-টাতে বাঙ্গলা ভাব প্রবেশ করিবার স্থান নাই।

তাই তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলি—অয়ি পাঠিকে! কান-নিকা কাব্যক্ষেত্রে চলিতে চলিতে যখন এত দূর আসিয়াছ, তখন আর একটু চল। তাহার পর তোমাগত প্রাণ, তোমার তাঁহার কাছে যত পার, কাননিকার নিন্দা করিও—সাবধান সুখ্যাতি করিও না। নিন্দা করিলে অন্ততঃ আমাকে গালি দিবার জন্য তোমার প্রভু সমস্ত বইখানি পড়িবে। তাহাতে আর কিছু হউক না হউক, ভাষাটারও ত উন্নতি হইবে! সুখ্যাতি করিলে আমার এত আদরের কাননিকার মুখ পানে কেহ ভুলিয়াও চাহিবে না।

এই গেল আমার ভাণিকার নান্দী। তার পর নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। বলি ওগো রঙ্গময়ী কল্পনে!—সভাটা সৌন্দর্য্যে প্রতিভায় উৎসাহে আকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহাকবি নরোত্তম ঠাকুর-রচিত কাননিকা-স্বয়ম্বর নামক নূতন নাটক লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে হয় না!—

অয়ি পাঠিকে! চতুর্দ্দশের পর আরও দুই চারি বৎসর অতীত মনে করিয়া লও। কর্ম্মক্ষেত্রে মানবভাগ্যের অনিশ্চিত পথে দুই চারি বৎসরের জীবনযাত্রা—কষ্টকর সত্য আমি মনে করিতে বলি না। সে কাজটা আমারও পক্ষে গর্হিত, আর তোমারও পক্ষে বড় সুখকর নয়। আর আমি বলিলেই বা তুমি মনে করিতে যাইবে কেন? চারি বৎসরের আগে হয় ত তুমি প্রকৃতির আদরের ধন, সন্ধ্যার কিরণ-মাখা তটিনীর তীরটিতে একা বসিয়া, চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে আশা, ধীরে ধীরে রাঙা পা দুটি দোলাইয়া, তাহাতে কোমল-তরঙ্গের ঈষৎ ঈষৎ চুম্বন মাখাইয়া, অতি যত্নে, অতি আদরে কলনাদিনীর সোহাগটুকু বুকে লইতেছিলে। আর আজ হয় ত তুমি সেই তরঙ্গিণীর বুকে। যে সোহাগ, যে আদর তুমি কল্পনার হাত দুটিতে হৃদয়ে ধরিয়া একা একা বিনা আয়াসে, আপনাকে সম্রাটের সিংহাসনের বামে বসাইয়াছিলে, আজ হয় ত সে আসনের সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণী-তরঙ্গের ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাতে, তার স্রোতের তীব্রতায় তোমার প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়াছে। কেন তবে চারি বৎসরের স্মৃতি জাগাইয়া, আকাশটাকে মেঘনির্ম্মুক্ত করিয়া, হতাশার জ্বালাময় কিরণগুলাকে শতগুণে প্রখর করিয়া তুলিব? তুমি ত সুখী হইবে না, আর তোমাকে অসুখী করিয়া

আমারও বড় সুবিধা হইবে না। তুমি অসুখী হইলে, দিবারাত্র নয়ন মুদিয়া সেই চারি বৎসরের আগের কথা ভাবিতে বসিলে, আমার কাননিকার কথা শুনিবে কে? তাই বলি, একেবারে একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে কাননিকার জীবনের চারি বৎসর উড়াইয়া দাও। দেখিতে পাইবে, নিরঞ্জনের গৃহে মহা সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বহু কাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ কাননিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আশায় আশায় উৎফুল্লা হইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইয়াছিল। কিন্তু চিরদশমী কাননিকার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তখন বিধাতাকে অজস্র গালি দিয়া, নিজ নিজ বিবাহিতা অবস্থাকে ধিক্কার দিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবেই ছিল। সহসা এক দিন সকল সীমন্তিনীর নিদাঘনিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিরঞ্জনের গৃহস্থিত একটা কোণমার্জ্জারের তীব্র চীৎকারে সকলেই জাগিল। জাগিয়া, বুঝিল, 'আজ নাত্তিনীর অধিবাস, কাল নাত্তিনীর বে।'

অধিবাস-সভায় চারি দিক হইতে লোক আসিতেছিল। নিরঞ্জনের গৃহসম্মুখস্থ পথ লোকপূর্ণ, আশে পাশের গলি স্থানশূন্য, পিক পাপিয়া দোয়েল টিয়া—নানাজাতীয় পক্ষীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গানে গানে গগন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। মুখর তরলতরঙ্গ সরসী ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছিল। এক সখী এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে আর এক সখীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই গঙ্গাজল! সেনেদের বাড়ী আজ কি?"

২য় সখী। সেন বুড়ো বুঝি মরিয়াছে। তাই বুঝি তার চতুর্থী।

১ম সখী। আহা বৃদ্ধের কি হইয়াছিল?

২য় সখী। আমাদের বাবু বলিয়াছিলেন, সে রোগের নাম নিদানে নাই।

১ম সখী। আহা, তবে ত বৃদ্ধ বড় কষ্টই পাইয়াছে!

২য় সখী। সে কথা ভাই আর বলিতে? জানা রোগেই কত কষ্ট, তা এ ত না জানা!

১ম সখী। ডাক্তারে রোগটা চিনিতে পারিল না! সেই যে কি কাণে দিয়ে, বগলে দিয়ে রোগ ধরে, তাতেও ধরা পড়িল না—বলিস্ কি ভাই গঙ্গাজল! তা কখন মরিল?

২য় সখী। বুড়ো কোন কর্ম্ম কবে পাড়ায় জানাইয়াছে, তা এত বড় একটা মহৎ কর্ম্ম জানাইবে?

১ম সখী। তা ভাই, সকল কর্ম্মেই আমরা মেনেদের নিমন্ত্রণ করি; তার মেয়েরা এত সমারোহ করিতেছে, পাড়ার দু' চারি জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না? আমরা তাদের না হয় কিছু খাইতাম না।

এই সময় ঘীয়ের গন্ধ তাহার নাকে আসিল, আর লোক-কোলাহল ছাপাইয়া লুচিভাজার কল কল শব্দও তাহার কাণে পশিল। চক্ষুই বা শুধু থাকিবে কেন? সে জলে ভরিয়া গেল। গলাই কি চোর? সে কতকগুলা অর্দ্ধস্ফুট করুণ স্বর ধরিয়া রাখিল, এবং অপরছাদস্থা দ্বিতীয়া সখীর দিকে একটি একটি করিয়া ছাড়িতে লাগিল।

করুণরস-রোগটা নারীকুলে বড় সংক্রামক। প্রথমের দেখা-দেখি দ্বিতীয় সখীরও গলাটা দেখিতে দেখিতে ধরিয়া গেল। কথাগুলা অনুনাসিক হইয়া পড়িল। তখন পরস্পরকে নিজ

নিজ গৃহের বড় বড় সমারোহের কথা শুনাইতে লাগিল। কত লুচি, কত সন্দেশ, কত অগণ্য মাছের মুড়াভরা তরকারি, তাহারা গাছকোমর বাঁধিয়া পরিবেশন করিয়াছিল; কত নিমন্ত্রিতা, পেটুকশিরোভূষণা নাসিকার গহ্বর পর্য্যন্ত আহার্য্যে পূরাইয়া, হৃতবাক্‌শক্তি, সবলয়-প্রকোষ্ঠ কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দূর হইতে পরিবেশিনীকে ফিরাইয়াছিল; সমস্ত যেন তাহাদের তখনকার কথা মনে হইতে লাগিল। এত করিয়াও কিন্তু তাহাদের প্রাণে তৃপ্তি আসিল না। তখন নিরঞ্জনের কন্যাকুলের নানাবিধ নিন্দা করিয়া, লুচিগন্ধবিক্ষোভিত হৃদয়-স্রোতস্বিনীকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। সর্ব্বশেষে নিরঞ্জনের প্রেতাত্মার অধোগতি দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে, তাহার গৃহে ভোজনের অযৌক্তিকতা, এবং নিমন্ত্রিতা হইলেও যাইবার অনিশ্চয়তা, অর্থাৎ যাইলে জাতিপাতের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া, ম্লানমুখে আবার নিরঞ্জনের গৃহ পানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় আর এক সখী, আর এক ছাদে উঠিল। তাহাকে সমদুঃখভাগিনী দেখিয়া, দুই জনেরই মনে একটু আনন্দ ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়াও নিরঞ্জনের বাড়ীর কোলাহলের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছিল। প্রথমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ভাই মকর! খাইলে কেমন?" তৃতীয়া শুনিতে পাইল না। তখন দ্বিতীয়া একটু রহস্য করিল—মকরের এখন বড় লোকের সঙ্গে ভাব, সে কি আর আমাদের কথা কাণে তুলিবে—মানহানি হইবে না!" মকর এতক্ষণে বুঝিল, তাহার মত অন্যান্য ছাদেও, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য

লোক উঠিয়াছে।—সে আর তাহাদের কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। একেবারেই জিজ্ঞাসা করিল,—"সেনের বাড়ী আজ কি ভাই ?"

১ম সখী। কেন ভাই! তুমি কি জান না ?

৩য় সখী। জানিলে আর জিজ্ঞাসা করি ?

১ম সখী। কেন, তোদেরও কি নিমন্ত্রণ করে নি ?

৩য় সখী। কিসের নিমন্ত্রণ ?

২য় সখী। শুনিস্ নি!—সেন বুড়ো যে মরিয়াছে।

৩য় সখী। আহা কবে ?

২য় সখী। আজ চতুর্থী।

৩য় সখী। কি জ্বালা! সেন বুড়ো মরিতে যাইবে কেন ? ওই যে গো, বৃন্দেহস্তীর মত পোষাক পরিয়া, সেন বুড়ো কতকগুলো ভট্‌চায্যির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। ওই যে চার পাঁচ জন লোক সেন বুড়োকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ওই দেখ্, সেন বুড়ো আবার নাপিত দিয়া গোঁফ কামাইতে বসিল। তখন প্রথমা ও দ্বিতীয়া, বলিস্ কি বলিস্ কি বলিতে বলিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যাগমে আকাশ ঘোর হইয়া আসিতেছিল।

তৃতীয়া তখন নবোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ বামুনগুলো আপনা আপনির ভিতর ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে।"

সহসা এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, আর একটি ছাদের উপর উঠিয়া, পিতা ও মাতার উদ্দেশে কতকগুলা সকরুণ বিলাপ সন্ধ্যার মৃদু বাতাসের উপর চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সকলে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে ?"

"আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি যে নিষ্ঠুরের জন্ত এতক্ষণ ধরিয়া রান্নাঘরে ধোঁয়া খাইতেছিলাম, সে আমাকে অনাথিনী করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

১ম, সখী। হায় হায় কি বলিলি বাছা! অনাথিনী করিল, তাতেও তৃপ্ত হইল না—চলিয়া গেল!—অনাথিনী করিলি করিলি, ঘরে রহিলি না কেন?

২য় সখী। কোথায় গেল বলিয়া গেল কি?

৩য় সখী। মা তোর সঙ্গে কি ঝগড়া করিয়া চলিয়া গেল?

প্রৌঢ়া। ওগো ঝগড়া নয় গো বাছা ঝগড়া নয়; কোনও কথা হয় নি গো! আমি কি ঝগড়ার লোক গা? আফিস থেকে এলো, আমি পা ধোবার জল রেখে খাবার আনতে গেছি। এসে দেখি গাড়ু পড়ে গামছা পড়ে—সে নেই। তার পর জলখাবার হাতে করে কত খুঁজলুম—কোথাও নেই। এত রাত্তির হ'ল, এখনও এলো না। তার পর শুনি, সে সেনেদের বাড়ী গেছে,—ওগো আমার কি হল গো! ওগো মাগো! আমি যে তোমার বড় আদরের মেয়ে গো!

২য় সখী। সেনেদের বাড়ী গেছে যখন জানতে পেরেছ, তখন আবার কাঁদছ কেন বাছা! বেশ ত! তোমার জন্ত লুচি আনবে।

প্রৌঢ়া। আমার পিণ্ডি আন্‌বে। সেনের বাড়ীতে কি এক স্বয়ম্বর হচ্ছে, সেখানে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক আসছে। যদি ভুলে আমাদের কর্ত্তার গলায় মালা দেয়, তা হলে এই বয়সে আমি আবার কার শরণাপন্ন হ'ব গো!—ওগো মাগো!—

'স্বয়ম্বর' কথাঘাতে তিনটি সখীর হৃদয়-তন্ত্রী একেবারে বাজিয়া উঠিল। সকলেই তখন সেনেদের বাড়ীর কোলাহলটা

বেশ করিয়া বুঝিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়ার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতে সময় পাইল না। তার দিকে আর ফিরিয়াও দেখিল না। বলিস্ কিগো!—সে কি কথা গো!—বলিতে বলিতে তর তর করিয়া ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। গজগামিনী, সৌদামিনী—দেখিতে দেখিতে মিলাইল।

এ দিকে নিরঞ্জনের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে মহা ধুম। বাগানের ভিতরে একটি সুন্দর সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে চারিধারে সুসজ্জিত সুমণ্ডিত মঞ্চাবলি। মঞ্চগুলির আশে পাশে সম্মুখে উপরে মখমলের ঝালর। উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া। মাঝে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা। ফোয়ারাকে বেষ্টন করিয়া চীনের টবে ছোট ছোট গাছ। চারিধারের বস্ত্রমণ্ডিত বংশ-স্তম্ভে সুন্দর সুন্দর ছবি। একটিও বিলাতী নয়। এইখানেই সকলের বিস্মিত হইবার কথা। কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কেন না, এটা কাননিকার স্বয়ম্বর-সভা। সভাটা সেই পৌরাণিক প্রথার অবলম্বনে খাঁটি হিন্দুমতে ময়দানবের বংশধর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। খাঁটি পৌরাণিক প্রথার অনুকরণে, টোলো পণ্ডিতের বিধানে, এখানে ভারতীয় নাটকের অভিনয় হইবে। কাজেই এখানে সব দেশী; বিলাতীর গন্ধও নাই। দেশী মানুষ, দেশী পশু, দেশী দাস, দেশী দাসী। দেশী গোল, দেশী বোল, দেশী চাহনি, দেশী হাসি। বিলাতী গন্ধও ছিল না। বরকুল কেমন এক রকম জাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া এসেন্স্ মাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে যে যার বাড়ীর লোকে ধরিয়া তাহাদিগকে গন্ধকুঙ্কুম কস্তরী দিয়া সুবাসিত করিয়াছে।—বিলাতীর গন্ধ ছিল না; কিন্তু নাম ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না,

অনেকেরই পায়ে বিলাতী জুতা ও মোজা ছিল, গায়ে বিলাতী রেশম পশমের পোষাক ছিল। চোখে বিলাতী চশমা, বুকে বিলাতী ঘড়ী, হাতে বিলাতী ছড়ি। আর কি ছিল না ছিল, ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তবে এটা আমরা বেশ বলিতে পারি যে, সে সকল পদার্থেরও গন্ধ ছিল না।

সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সকাল হইতেই লোকের ভিড় আরম্ভ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় দেখা গেল, নিরঞ্জনের গৃহের সমীপস্থ পথ, অলি গলি, ছাদ প্রাচীর, খোলার চাল—দেয়ালের ফাটল পর্য্যন্ত লোকে পূরিয়া গিয়াছে। ড্রেনের ভিতর লোক ঢুকিয়াছে। বাগানের গাছে গাছে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, পাতার শিরে শিরে, লোক বাদুড়ঝোলা ঝুলিতেছে। নিরঞ্জন নিরুপায় হইয়া, পুলিশের শরণাপন্ন হইলেন। পুলিশ, রমণীর প্রেমে বঙ্গবাসীর এই অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। স্বদেশ-প্রেমে ইহা হইতে আরও কত অধিক উৎসাহ দেখাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া চিন্তিত হইল। সে উৎসাহে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না ভাবিয়া, শঙ্কিত হইল না। আর বাঙ্গালী একবার উৎসাহিত হইলে ইংরাজের রাজ্য থাকা ভার হইবে ভাবিয়া, কেমন একরকম হইয়া গেল। শেষে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত রুলসংযুক্ত হাত ও জুতাসংযুক্ত পা চারিধারে ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; তখন পুলিশের বড় কর্ত্তা কেল্লায় খবর দিল। কেল্লা হইতে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে ফৌজ আসিল। তখন

কারো বা ভাঙিল হাত, কারো ভাঙে পা;
কেহ বলে ওরে বাবা, কেহ ডাকে মা!

কারো গেল নাক ভেঙে, কারো ভাঙে হাড়;
কেহ বা উছট খায়, কেহ বা আছাড়।
কেহ বা আগুণে পড়ে, কেহ পড়ে জলে;
পিলে ফেটে গেল কারো, পিত্তি গেল গলে।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকল গোলমাল থামিল। কিন্তু গোল থামিতে থামিতে সোডা লেমনেডের দশবিশলক্ষ বোতল খালি হইয়া গেল। নাগরদোলা দশ বিশ কোটি বার ঘুরিয়া ফেলিল। এমন কি, এক এক খানা পাঁপরভাজা এক এক টাকা দরে বিক্রীত হইল। এমন সমারোহ যে রাজসূয় যজ্ঞেও হয় নাই, আমরা সে সংবাদ লইয়াছি।

পল্টন চলিয়া গেল। পুলিসের সাহায্যে লোক বাছিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ঠিক বাছিতে যে গাঁ উজোড় হয়! তার উপায়? তখন অনেকগুলি দেশের বড় বড় মাথা একত্র হইয়া দুই চারিটি বিলাতী মাথার সাহায্যে স্থির করিল, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার টিকিট করা হউক; তাহাতে যে অর্থাগম হইবে, তাহার কতক মরিশস্ দ্বীপে সুশৃঙ্খলায় কুলিচালান কার্য্যে ব্যয়িত হউক, কতক, লোক ঠেঙাইয়া পুলিশ ও পলটনের হাতে যে বেদনা হইয়াছে, সেই বেদনা মারিতে ডারলিংটনের পেন কিওরার কিনিয়া দেওয়া হউক।

সন্ধ্যার পর রীতিমত প্রাবেশিক মূল্য দিয়া বরকুল আস্থান-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকল মঞ্চ পুরিয়া গেল। যে সকল মহাত্মা সন্তানকে সোণার সঙ্গে ওজন করিয়া, কন্যাকর্ত্তাগণের নিকট হইতে পণ লইবার প্রত্যাশায়, ছেলেদের পাঁচ ছয়টা পাশ করাইয়া জাওলা দিয়া রাখিয়াছিল;

তাহাদের মাথায় সহসা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ কেহ বা সভামণ্ডপ-দ্বারে আসিয়া, হত্যা মারিল। কেহ কেহ বুদ্ধিমান প্রাবেশিক মূল্য দিয়া, মাথা গুঁজিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পুরুষের ভাগ্য দেবতাও জানে না। যদি কন্যা ভুল করিয়া, পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, বাপের গলায় বরমাল্য দেয়, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। পিতারও একটি স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, আর পুত্রের বিবাহে জমিদারি-সংগ্রহও কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

ভিতরের গোল মিটিয়া গেল। টিকিটবিক্রেতা নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, সভাস্থলে আর সরিষা ধরিবার স্থান নাই। মঞ্চে মঞ্চে মানুষ ভরিয়াছে, মানুষের ঘাড়ে মানুষ চাপিয়াছে। কেহ কেহ বা কাহারও কাহারও কোলে উঠিয়াছে।

সহসা বাহিরে আবার একটা গোল উঠিল। আবার কিসের গোল? গোল আর কিছুর নয়।—নিরঞ্জন স্বয়ম্বর কার্য্যটা শাস্ত্র-সম্মত করিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক আনাইয়া, ব্যবস্থা লইতে-ছিলেন। তাঁহারা এখন তৈলবটের পরিবর্ত্তে সভাগৃহে প্রবেশ-লাভের জন্য নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া ধরিয়াছেন। নিরঞ্জনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিবার জন্য নানাজাতীয় শ্লোক-সোপানে উঠাইয়া দিতে-ছেন। দেবভাষা সংস্কৃতের এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার সাহায্যে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, অতি বড় বুদ্ধিমান চাটুবিরোধী পণ্ডিতেও আপনাকে হারাইয়া ফেলে। নিরঞ্জনেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার জরা বিনা বার্দ্ধক্য, অধ্যয়ন বিনা পাণ্ডিত্য, রূপ বিনা সৌন্দর্য্য, অর্থ বিনা ঐশ্বর্য্য, ভূমি বিনা রাজত্ব ও শচী বিনা ইন্দ্রত্ব—এইরূপ নানাজাতীয় রূপকের ভিতর পড়িয়া, নির-ঞ্জন কিয়ৎকালের জন্য, আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি,

কি করিতে হইবে, সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই যেন নন্দনকাননটা চোখের উপর দেখিতেছিলেন। দুই চারিটা পারিজাতের ফুল তাঁহার নাকের উপর যেন ঝরিতে লাগিল। দুই চারিটা কল্পবৃক্ষের ফল তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। ঐরাবত তাঁহাকে দেখিয়া যেন মাথা নামাইয়া শুণ্ড ঘুরাইতে লাগিল। উচ্চৈঃশ্রবা তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন তখন অতি নম্রভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

চারি দিক হইতে অধ্যাপকমণ্ডলী সমস্বরে গাহিয়া উঠিল,—"জয়শ্রী বৈদ্যরাজঃ ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী !"

১ম অধ্যাপক। হে মহামহিমান্বিত বৈদ্যকুলভাস্কর !

২য় অধ্যা। হে সুধীর-অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বর্ণশঙ্কর !

৩য় অধ্যা। হে কন্দর্পগর্ব্বখর্ব্বকারী চারু সুন্দর !

৪র্থ অধ্যা। হে নরদেবতানাঞ্চ শুভ্রযশস্তস্কর !

নিরঞ্জন। আপনারা এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যা'তে সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১ম অধ্যা। আপনার এই তৈলবট-প্রতিগ্রহণ কার্য্য সমাধা করে—

২য় অধ্যা। আজ্ঞে—তৈলবটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আদেশ বিধান করে—

নিরঞ্জন। অন্য আদেশ আবার কি ?

৩য় অধ্যা। মহাত্মা আজন্মশুদ্ধঃ আফলোদয়কর্ম্ম—

৪র্থ অধ্যা। আসমুদ্রক্ষীতীশঃ—

১ম অধ্যা। আজানুলম্বিতঃ—

২য় অধ্যা। আকর্ণবিশ্রান্তঃ, আনাকরথবর্ত্ম—

নিরঞ্জন। আপনাদের বক্তব্য কি ?

১ম অধ্যা। হা হা—বক্তব্য কি ?—কি জানেন, কাকুৎস্থ-গেহিনী জনকনন্দিনী, ত্রেতাযুগে, রক্ষবংশধ্বংসাভিলাষিণী হয়ে, গুণনিধি রাঘবকে রাবণারি করবার জন্য, হরধনুর্ভঙ্গকারী সেই দয়াময় হরিকে স্বয়ম্বরে মাল্য প্রদান করেছিলেন।

২য় অধ্যা। ঠিক, ঠিক—

লজ্জাকীর্ত্তিজনকতনয়াঃ শৈবকোদণ্ডভঙ্গে,

ত্রিস্রঃ কন্যাঃ নিরুপমতয়া ভেজিরে রাঘবেন্দ্রং।

অর্থাৎ, রাঘবের মধ্যে ইন্দ্র হচ্ছেন যে রাম, সেই রামকে ভজনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন। করেছিলেন, করেছিলেন, তাতে আমার কি ? ঠাকুর ! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি চল্লুম।

৩য় অধ্যা। বেশ বেশ, চলুন চলুন—

নিরঞ্জন। আপনারা কোথায় যাবেন ? সেখানে আপনাদের স্থান নাই।

৪র্থ অধ্যা। কি জানেন, দ্বাপরে কুরুকুল নির্ম্মূল করতে দ্রুপদনন্দিনী স্বয়ম্বরা—তাতে কি জানেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র,—এই চতুর্ব্বর্ণেরই শুভাগমনে সেই স্বয়ম্বর-সভা—কি জানেন—

১ম অধ্যা। কি জানেন—যথা কাশীদাসে—দ্বিজ হোক, ক্ষত্র হোক, বৈশ্য শূদ্র আদি—

নিরঞ্জন। কি জ্বালা!—আপনারা বলতে চান কি?—আরও কিছু অর্থের কি প্রার্থনা করেন?

১ম অধ্যা। যথেষ্ট যথেষ্ট—আপনি দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু হয়ে—

২য় অধ্যা। দেখ তর্করত্ন! বয়সের সঙ্গে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লুপ্তা হচ্ছে—তুমি এত গুলা অধ্যাপকের সম্মুখে একটা ব্যাকরণ-দুষ্টা কথা বল্‌লে হে! নিরাপদেষু কথাটা না বলে নিরাপৎস্থ—

নিরঞ্জন। ঠাকুর! তোমরা ওই বেঞ্চিতে বসে তর্ক কর। আমি আসি।

ব্রাহ্মণগণ আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ঘেরিল। নিরঞ্জন এতক্ষণ কতকটা ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বারম্বার বাধায়, তাঁর ভাব ভাঙিয়া গেল। একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমরা কি চাও?"

সকলে। ক্রুদ্ধো মা ভব, ক্রুদ্ধো মা ভব।

নিরঞ্জন। তবে কি বলতে চাও, শিগ্‌গির বল। আমি তোমাদের জন্য মিছে সময় নষ্ট করিতে পারি না।

সকলে। ক্রোধং মা কুরু, ক্রোধং মা কুরু।

নিরঞ্জন। আরে মল! এ ত ভাল বিপদেই পড়া গেল।—দেখ ঠাকুররা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করচ।

১ম অধ্যা। মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।

সকলে। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।

নিরঞ্জন। কে আছ, এখানে এস ত হে। এই বামুনগুলোকে গলা টিপে এখান হ'তে বার করে দাও ত।

২য় অধ্যা। কি বর্ব্বর বৈশ্যাধম! ব্রাহ্মণের গলায় হস্ত প্রক্ষেপ করতে, তোমার বাহুবল্লী ভগ্না হবে না?

৩য় অধ্যা। তোমার করকমলিনী এত সাহসিনী!—

এই সময়ে একজন বলণ্টিয়ার (১) আসিয়া বলিল, বাড়ী হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কুমারী একা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক।

৪র্থ অধ্যা। একা!—অনিচ্ছুকা!—

১ম অধ্যা। অহো! ভর্ত্তৃদারিকার একা স্বয়ম্বরে থাকা কোন্ বর্ব্বরে বিধান দিলেক?

২য় অধ্যা। কোন্ প্রজ্ঞাশূন্য, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, শাস্ত্রমর্ম্মানভিজ্ঞ, অজ্ঞাতকুলশীল অধ্যাপক এমন অশাস্ত্রীয় বিধানটা প্রদত্ত করিলেক?

নিরঞ্জন। সে ত তোমরাই। বিটলে বামুন! দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।

৩য় অধ্যা। হা হা হা! ভ্রমপ্রমাদবশতঃ, তাদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্তা।

৪র্থ অধ্যা। তাই বা কেন?—শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ—কি বল সার্ব্বভৌম?

২য় অধ্যা। সে ত বিধান আছে—কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নিরঞ্জন। নাও, এখন বেড়র বেড়র রেখে, কি কর্‌তে হবে বল।

১ম অধ্যা। একজন বেত্রধারিণী সখীর প্রয়োজন। তিনি ভর্ত্তৃদারিকাকে সহচরী করতঃ, প্রতিমঞ্চের সমুখে যাওত বরপাত্রের কুলশীল বিঘোষিত করিবেন।

---

(১) উপযাচক হইয়া পরসেবায় নিযুক্ত বীর। স্বেচ্ছাসেবক।

নিরঞ্জন। বেত্রধারিণী আবার কি ?

২য় অধ্যা। বেত্রধারিণী বললেও হয়—বেত্রধরা বললেও হয়।

৩য় অধ্যা। শুদ্ধমাত্র বেত্রধরও বললেও হয়।

৪র্থ অধ্যা। বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা বললেই ভাল হয়।

নিরঞ্জন। আর তোমাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করলে আরও ভাল হয়। কি আপদেই পড়া গেছে—বলি সে জিনিসটে কি ?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে, তিনি বস্তু নহেন, ব্যক্তি।

বলণ্টিয়ার। তা ত বোঝা গেছে—তিনি পুরুষ কি স্ত্রী ?

২য় অধ্যা। আরে বাপু! তিনি ত্রিষু—অর্থাৎ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃতঃ—শ্রীবিষ্ণু—ব্যবহৃতং—শ্রীবিষ্ণু ব্যবহৃতা হইতে পারেন।

নিরঞ্জন। সব হইতে পারেন, আর তোমাদের মুণ্ডচর্ব্বণ করিতে পারেন না! এই সময় আর এক জন বলণ্টিয়ার আসিয়া বলিল, "মহাশয় আর বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন ? এ দিকে সাতটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই।" নিরঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া আবার একটু নরম হইলেন। হাতজোড় করিয়া বলিলেন,—"কি করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন। বাজে কথায় আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড করাইবেন না।"

বলণ্টিয়ার। বেত্রধারিণী কি সহচরী ?

১ম অধ্যা। হাঁ—কিন্তু অনুক্রমজ্ঞা।

বলণ্টিয়ার। পুরুষ হইলে হয় না ?

২য় অধ্যা। কেন হবে না ? অবশ্য হবে। তবে তিনি হবেন, শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিতা।

৩য় অধ্যা। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কি বললে হে সার্ব্বভৌম! কথাটা যে ব্যাকরণদুষ্ট।

বলণ্টিয়ার। আপনারা হইলে চলিবে কি?

সকলে। হা হা হা!—(উচ্চহাস্য) চলিবে, চলিবে—বিশিষ্টভাবেই চলিবে।

৪র্থ অধ্যা। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

নিরঞ্জন। কি! এই কটা পাগলকে সভায় প্রবেশ করিয়ে সব মাটী ক'রে বসব? দাও, ওদের দু'চার টাকা দিয়ে বিদেয় করে দাও। এখন আর মেয়ে কোথাই পাই, আমি নিজেই না হয় তারে সঙ্গে করে আনি।

১ম অধ্যা। কিন্তু মহোদয় যে শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত।

নিরঞ্জন। পরামাণিক!—

প্রামাণিক ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন,—"দে আমার গোঁপ দাড়ী কামাইয়া দে।" প্রামাণিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। দেনা বেটা! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণগণ বাধা দিল,—"হাঁ হাঁ—রাত্রিকালে ক্ষৌরকার্য্যং ন বিদুষাং মতং।" নিরঞ্জন এইবারে একটা লাঠী লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অধ্যাপকগণ "অকর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য" বলিয়া হাত তুলিল। বলণ্টিয়ার বলিল, "ঠাকুর! নাপিতপ্রাপ্তিমাত্রেণ ক্ষৌরকর্ম্ম বিধীয়তে।" তখন ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ মত লইয়া প্রমাণপ্রয়োগাদি করিতে ব্যস্ত হইল। ইত্যবসরে নিরঞ্জন ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিলেন।

তার পর দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্রোধে দর্পণে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। "কে তুই কে তুই" বলিয়া প্রতিবিম্বের দিকে মুখভঙ্গী করিলেন। মুখভঙ্গীতে সে নিরঞ্জনকে উত্তর দিল। দর্পণ দূরে ফেলিয়া নিরঞ্জন সভা-

প্রবিষ্ট হইতে যাইতেছেন, দ্বারবান চিনিতে পারিল না, বাধা দিল। তখন অতিক্রোধে, তাঁহার এই দুরবস্থার কারণ সেই তর্কনিরত ব্রাহ্মণগুলাকে মারিতে গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বলণ্টিয়ারগণ, তাঁহাকে চ্যাঙদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।

অসমাপিকা।

যেদিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জন গোঁফ দাড়ী মুড়াইয়া দূতী সাজিলেন, সেই দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুমন্ত চোখেই কাননিকা একটি কবিতা লিখিল।

আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ।
শুধু বসে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা' হোক করিব আজ।
টেবিলের 'পর সারি সারি সারি
ছিল যত বাঁধা বই—
শুধু মুখপানে চাহিয়া রহিল—
"অবাক করিলে সই!
এতগুলা সখী আছি চারিধারে
লয়ে এতগুলা হিয়া;
ভাঙ্গে না কি সই আলস তোমার
তাহার একটি নিয়া?"
"ভাঙে না কি সই আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
গিরি উপবন, সাগর গগন,
অভ্র ভেদিয়া রবি;

কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কুটীর
ভ্রমর-সেবিত ফুল,
সলিল-সেবিত শ্যাম প্রান্তর
বক্র নদীর কূল,
সমীর-সেবিতা সরসীর তীরে
তরুলতা নানাজাতি,
তারা-নিষেবিত স্থির শশাঙ্ক
চাঁদিনী-সেবিতা রাতি।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?"
কহিল দেয়ালে ছবি—
চির-জাগন্ত সমর-বিজয়ী,
চির-ঘুমন্ত কবি,
জল-ভরা আঁখি, প্রথম মিলন,
মুখ ভরা ভরা হাসি,
বক্ষ-ভরা ঘন কম্পন
দীর্ঘ-নিশাস-রাশি।
মৃগ-শিশু-ধরা দুধের বালক,
মেষ-শিশু-ধরা মেয়ে,
নব বিরহীর শিলায় শয়ন
নৈশশূন্যে চেয়ে।
"ভাঙে নাকি সই! আলস তোমার?"
আমি যদি কথা বলি,
আমি যদি ভাই! ভুলায়ে তোমার
হাতে তুলি দিই তুলি?

নিরালায় বসে থাকিবে আলসে ?
বিষম তোমার ভুল।"
সাজিতে বসিয়া কহিল হাসিয়া
ফুটে-ওঠা-ওঠা ফুল।
সমীর-চুম্বিত চন্দ্র-কিরণ
কুসুম-গন্ধে ভরা,
বাতায়ন-পথে পশিয়া পশিয়া
আমারে করিল ঘেরা।
আমারে ঘেরিল সুধার ধারায়
দূর কোকিলের গান।
আমারে দেখিল দূর দর্শনে
একটি নিভৃত স্থান।
আমারে ডাকিল মধুর মর্ম্মরে
শ্যাম সুন্দর বট,
আর তার সেই ছায়া সোহাগিনী
শ্যাম সরসীর তট।
আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
কিছুই নাহিক কাজ ;
শুধু বসে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
যা হোক করিব আজ ;
ভাঙিব আলস। এমন সময়
ফুল-গন্ধ-স্রোতে
ভাসিয়া আসিল মধুর কণ্ঠ
মধুর চাঁদিনী রাতে।

খুলে দিল কত তন্ন তন্ন
জীবনের ইতিহাস,
ঢেলে দিল কত অশ্রু-গর্ভ
বছরের বার মাস!
এনে দিল কত আদর সোহাগ,
এনে দিল কত জ্বালা,
ধরে দিল কত পাদ্য অর্ঘ,
খুলে দিল কত মালা।
উচ্চে উচ্চে উঠিল কণ্ঠ,
আকাশে ডাকিল বান;
কি করি কি করি ভাবিতে ভাবিতে
ভাসিয়া যাইল প্রাণ।
শুধু বসে থাকা শুধু বিড়ম্বনা,
কি আর করিব কাজ?
হে অজ্ঞাত! তোমার সঙ্গে
আমিও গাইব আজ।
হে অজ্ঞাত! হে অনিশ্চিত!
হে নিঠুর! শুধু স্বর!
জীবনের পথে করিতে সঙ্গিনী
হবে কি আমার বর?
জীবনের পথে করিতে সঙ্গী
কাঁপিয়া কণ্ঠ গায়,
লইবে কি মোরে হে চারু নিঠুরে!
রাখিবে কি রাঙা পায়?

আমি বলি তুমি আমার রাজা,
সে বলে আমার রাণী ;
আমি বলি তুমি বড়ই পাগল,
সে বলে পাগলিনী।
আমি বলি তুমি এস না নিকটে,
সে বলে কেন হে দূরে ?
আমি বলি তুমি জ্ঞানশূন্য,
সে বলে তোমার তরে।
আমি বলি তুমি চুপ করে রও,
সে বলে কয়ো না কথা ;
তোমার উপর রাগটি আমার
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা।
আমি বলি তুমি সেই সে পঞ্চমে
একবার দেখা দিলে !
সে বলে তুমি এই এত কাল
কেমনে রয়েছ ভুলে ?
সে কি মোর দোষ ? তবে কি আমার ?
তবে হে সে দোষ কার ?
যুগ্ম কণ্ঠে গাইয়া উঠিনু
দোষ শুধু বিধাতার।
আমার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল,
ওদিকে থামিল গান ;
কথা হল শুধু,— হল নাক দান,
হলনাক প্রতিদান।

এর পর আর লিখিবার কিছু ছিল কি না, জানি না; কিন্তু কাননিকার আর লেখা হইল না। লিখিতে লিখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দুই এক ফোঁটা জল পত্রের উপর পড়-পড় হইল। কাননিকা চেষ্টা করিয়া স্রোত নিবারণ করিতে গেল; হাত দিয়া বার বার চোখ মুছিল। কিন্তু স্রোত থামিল না। আপনা-আপনি বলিল—"যাক, আর লিখিব না। হৃদয়ের সকল কথা অক্ষরে ফেলিবার ধৃষ্টতা আর করিব না। অশ্রুজলের অক্ষর কই? লিখিয়া কি এ মহাকাব্যের শেষ করিতে পারিব? তবে এ অতৃপ্ত উন্মত্ত হৃদয় লইয়া আকাঙ্ক্ষার পারে যাইবার এ বিড়ম্বনা কেন? যেখানে কামনার অপূর্ণতাই তৃপ্তি, যেখানে ভাবের উন্মেষেই ভাবশূন্যতা, আলস্যই যেখানে কার্য্য, সেখানে কাজ করিয়াছি বলিয়া এ অহঙ্কার কেন? কাজ নাই কবিতা লিখিয়া। হে ঈপ্সিত! হে সুন্দর! একবার কি দেখা দিবে? নিষ্ঠুর! আমার এ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এত ছল কৌশল কেন? তোমার স্বরতরঙ্গ বক্ষে ধরিয়াই কি জীবন কাটাইব? তোমার সৌন্দর্য্যসাগরে কি এক দণ্ডের তরেও ডুবিতে পাইব না? কাল সারানিশি তোমায় দেখিবার জন্য আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম। পৃথিবী পানে চাহিতে সাহস হইল না। হয় তুমি চাঁদ, কিংবা তোমাকে পাইয়া চাঁদ এত সুন্দর। তুমি কি পৃথিবীর কণ্টকময় বুকে কোমল চরণ দুটি ভ্রমেও কখন রাখিয়াছ? হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া একবার দাসীর পায় ঢালিয়া দাও। হে চাঁদের ধন! দাসীর হৃদয়-বহ্নি নিবাইতে চাঁদের সঙ্গে গলিয়া যাও!"

প্রথম মিলন কি শুধু একবার? দুই বার দশ বার নয়, শত

বার সহস্র বার নয়, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নয়? মিছে কথা। সমীরণ-স্পর্শ পলে পলে নূতন। প্রেম অনন্ত। তাহার বিরাট অঙ্গের যেখানে হাত দিবে, সেইখানেই নূতন স্পর্শসুখানুভব। যেখানে দেখিবে, সেইখানেই নূতন। যখন মিলিবে, তখনই প্রথম। সে মিলনে পলের সহিত পর পলের সম্বন্ধ নাই; দণ্ড হইতে দণ্ডান্তর বহুদূর, মাস হইতে মাসান্তর জন্মান্তরবিস্মৃতি, বৎসর হইতে বৎসর প্রলয়।

কাননিকা বলিল, "হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া দাসীর পায় ঢালিয়া দাও।" প্রিয় সঙ্গে শুধু মুখের কথা কহিয়া কাননিকার তৃপ্তি নাই। বুঝি দেখিলে, কাছে রাখিলে সকল তৃপ্তি মিলিবে! ভ্রম ভ্রম—পরস্পরলিপ্সু দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অস্থিপঞ্জরের যে ব্যবধান আছে!

কবিতা লিখিয়া কাননিকার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না; ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার মীমাংসা হইল না; কাঁদিয়া চোখের জল ফুরাইল না। কাননিকা স্থির করিল, আর ভাবিব না, আর কবিতা লিখিব না। যা লিখিয়াছি, এও রাখিব না। এই বলিয়া কবিতাটি ছিঁড়িতে যাইতেছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি কোমল কর, তাহার কোমলতর কর ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা ফিরিয়া দেখিল, হরিদাসী ঠানদিদি।

তাহাকে দেখিয়া লজ্জাভয়ে কাননিকার মুখ শুখাইয়া গেল।

জম্বুলমালিকা।*

হরিদাসী কাননিকার মাতামহীর দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃজায়া, নিরঞ্জনের শ্যালকপত্নী। কিন্তু ভামিনীর সমবয়সী সখী। ভামিনী তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, হরিদাসীও দুই দিন ভামিনীর সংবাদ না পাইলে নিরঞ্জনের বাটীতে ছুটিয়া আসিত। স্নেহময়ী নিরঞ্জন-পত্নী তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিত। নিরঞ্জনও হরিদাসীকে বড় ভাল বাসিতেন। নিরঞ্জন ননন্দৃপতি, কাজেই হরিদাসী তাহার সম্মুখে প্রগল্‌ভা হইতে কুণ্ঠিতা হইত না। হরিদাসীর স্বামী সত্যপ্রিয় রায় এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দু। নিরঞ্জনের সাহেবিয়ানায় তিনি বড় তুষ্ট ছিলেন না। বড় আত্মীয় বলিয়া তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেনপরিবারের সহিত সংস্রব রাখিতেন। আর সেই জন্য স্ত্রীকে সেনেদের বাড়ী যাতায়াত করিতে বড় নিষেধ করিতেন না। তাহার উপর তিনি হরিদাসীকে অতি দরিদ্রের ঘর হইতে আনিয়াছিলেন। পাছে কোন কথা বলিলে নিজের পৈতৃক অবস্থার স্মরণ করিয়া হরিদাসী দুঃখিতা হয়, এই ভয়ে তিনি তাহার উপর বড় একটা হুকুম চালাইতেন না। পরন্তু গৃহকার্য্যের সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার হাতেই ন্যস্ত করিয়া সত্যপ্রিয় কতকটা তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভ্যাসদোষে সে অধীনতাটা তাঁহার প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিত। স্বাধীনতার সুব্যবহারে হরি-

---

* বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের পরিহাস বাক্যপরম্পরা।

দাসী সত্যপ্রিয়র গৃহটী একটী সোণার সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যপ্রিয়র সন্তানাদি ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহাকে লইয়াই হরিদাসীর সংসার। তাহার বধূ, পুত্র ও কন্যা লইয়া হরিদাসী এমন ঘর পাতিয়া বসিয়াছিল, যে তাহার ভিতর পড়িয়া সত্যপ্রিয় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনাকে অপুত্রক বুঝিতে পারিতেন না। হরিদাসীর সব কাজই ভাল, কেবল একটী কাজ সত্যপ্রিয়র চোখে বড় ভাল ঠেকিত না। হরিদাসী তাহাকে কিছুই না বলিয়া নিরঞ্জনের পরিবারবর্গকে,—বিশেষ ভামিনীকে একটু অধিক রকমের ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের সঙ্গে বড় মাথামাথি করিত। সে ভালবাসার স্রোতে পড়িয়া পাছে হরিদাসী, সুবর্ণলতিকারূপিণী, ভাসিয়া যায়, পাছে মূর্খস্বামীর সঙ্গে তাহার ভক্তিবাঁধনটুকু ছিঁড়িয়া যায়, পাছে বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসৎকারাদি ক্রিয়াকলাপ উঠিয়া যায়, এই ভয়ে সত্যপ্রিয় তাঁহার স্ত্রীর সেনেদের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে মুখ ফুটিয়া সোজাসুজি ভাবে গৃহিণীকে বড় একটা কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, ঠারেঠোরে রহস্যের ছলে বলা না বলা করিয়া, দুই একটা কথা হরিদাসীকে শুনাইতেন। বুদ্ধিমতী হরিদাসী স্বামীর মনোগত ভাব এই রহস্যের ভিতর হইতেই বুঝিয়া লইত। কিন্তু কোন মতেই সে সেনেদের বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিত না। এতই সে ভামিনীকে ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে নিরঞ্জন জামাতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে আপনা-আপনি কি বুঝিয়া হরিদাসী সেনেদের বাড়ী যাওয়ার

ক্ষান্ত দিয়াছিল। আজ কাননিকার স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া, হরিদাসী বহুকালের পর এখানে আসিয়াছে।

সেনগৃহের সবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া হরিদাসীর আবার পূর্ব্বপ্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। তবে ভামিনীকে দেখিয়াই সে একটু কাঁদিয়াছে। আর রমণীচরণের কথার উল্লেখ করিয়া একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিয়াছে। দুইটী সখীর বহুদিনের পর পুনর্ম্মিলনে দুই জনেরই উপর কিছু কার্য্য করিল। হরিদাসী আহ্লাদে গলিয়া গেল, আর ভামিনীর উপর যা একটু আধটু ঘৃণা ছিল, সব ভুলিয়া গেল। আর পতি-সোহাগিনী হিন্দু সাধ্বীর অশ্রুপূর্ণ তরল নয়নজ্যোতিঃ পতি-ত্যাগিনীর চোখে পড়িয়া তাহাকে কিছু অনুতপ্তা করিল। ভামিনী বুঝিল,—

"সুখ, অতি আকাঙ্ক্ষায় সরলা ললনা প্রায়
লজ্জায় বসনে ঢাকে মুখ ;
হেদায় যে সুখ ক'রে, সদা কাল ঘুরে মরে,
তাহার কপালে নাই সুখ।"

আর বুঝিল, হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। তাহার পিতৃতিরস্কারে ও তাহার নিজের অবজ্ঞায় স্বামীর গৃহত্যাগের ছবি জীবন্ত হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। অপমানিত স্বামী আর ফিরিল না, তাহার তেজোগর্ব্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, আর তাহার সংবাদ লইল না। আর একটী বিশেষ দুঃখ, তাহার "সবেধন নীলমণি" কন্যা কাননিকাকে আর কেহ তাহার মত করিয়া ভাল বাসিল না। এইটীই তাহার বিশেষ দুঃখ। নিরঞ্জন কাননিকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু তবুও

কেমন তাহাতে ভামিনীর তৃপ্তি হয় না। সে ভালবাসায় তরলতা নাই। কাননিকার মুখে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া সে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এই অভাবটী সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। ভামিনী হরিদাসীর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করিল। হরিদাসী প্রতিকারের আশ্বাস দিল। বলিল, "রোস্, আগে তোর মেয়ের স্বয়ম্বর ব্যাপার মিটিয়া যাক্, তোর বাপের তেজ ভাঙ্গিয়া যাক্, তার পর যা হ'ক একটা উপায় করিব।"

হরিদাসী তাহাকে কাননিকার ঘর দেখাইয়া দিতে বলিল। ভামিনী নিজে সঙ্গে করিয়া কাননিকার কাছে লইয়া যাইতে চাহিল। হরিদাসী নিষেধ করিল,—বলিল, "আমি একা যাইব।"

কাননিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাননিকা কি করিতেছে। পা টিপিয়া পা টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কাননিকা জানিতে পারিল না, আপনার মনেই লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ করিয়া কাননি আপনার মনে যে কথা গুলি কহিতে লাগিল, হরিদাসী সব শুনিল। তার পর যেই কাননিকা কবিতাটী ছিঁড়িতে উদ্যত হইল, অমনি তার হাত ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা পাছু ফিরিয়া দেখে—হরিদাসী ঠানদিদি। সমস্ত কথা শুনিয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় ও ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

হরিদাসী কাননিকার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল, এবং সেই জন্য তাহাকে আবার পূর্ব্বভাবে আনিবার জন্য বলিল,—"দেখি দিখি, সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিবার বল তোর আছে কি না। আমার হাত ছাড়াইতে পারিলে বুঝিব, তুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইবি, বরের ঝাঁক হইতে মনোমত স্বামীটী বাছিয়া লইবি। দুই জনে সাঁতারিয়া কূলে উঠিবি।" কাননিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি যে হার মানিলাম ঠানদিদি! তোমার হাত ত ছাড়াইতে পারিলাম না।"

হরিদাসী। তবে আর স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি? সেখানে স্বামীটীকে ত পাইবিই না, শেষে কার গলায় মালা দিতে কার গলায় মালা দিবি। আমার বরটীও যে তোকে বে করিবার জন্য আসিয়াছে।

কাননিকা। ঠাকুরদাদা আসিয়াছে পাণিগ্রহণ করিতে, ঠানদিদি হাত ধরিল কেন?

হরিদাসী। তোর হাতে আর কেহ হাত দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য।

কাননিকা। আর কেহ এ হাতে হাত দিলে, ঠানদিদির বর কি আমায় লইবে না?—ভাল, পরীক্ষায় বুঝিলে কি!

হরিদাসী। বুঝিলাম, কাননিকার হাত দূর হইতে কে ধরিয়াছে। কাননিকা তার ঠানদিদির কাছে সে হাতের মালিককে গোপন করিবার জন্য মন-ভুলান হাসি হাসিয়া, তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় আছে।

আর বুঝিলাম, একটি বিদুষী, জ্ঞানগর্ব্বিণী বালিকা পুরুষোচিত হৃদয়বল ধরিয়াও, স্বাত্মাবলম্বনে অসমসাহসিনী হইয়াও কোন একটি বিশেষ কারণে, ভয়নাশিনী ঠানদিদিকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছে।

তার বায়ুতাড়িতা নাড়ী দ্রুতগামিনী, লজ্জা ভয়ে মুখ আরক্তিম, হস্তকম্পনে পত্রিকা পতনোন্মুখী।

হরিদাসী পত্রিকা খানি কাননিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। কাননিকা চিত্রপুত্তলিকার মত ঠাকুরাণী দিদির পানে চাহিয়া রহিল, একটীও কথা কহিল না।

হরিদাসী পত্রপাঠান্তে কাননিকার মুখের দিকে চাহিল। কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"মুখের দিকে দেখিতেছ কি?—তুমি যা ভাবিতেছ, তার কিছুই নয়। আমি মাসিক পত্রে দিবার জন্য কবিতাটী লিখিয়াছি। পত্রিকা-সম্পাদককে পাঠাইবার জন্য মোড়কে পুরিতেছিলাম।

হরিদাসী। অসম্পূর্ণ কবিতা পাঠাইলে সম্পাদক ছাপাইবে কেন? তাহার সঙ্গে হাতের কম্পন, বক্ষের তরঙ্গ, আর চোখের লজ্জা সংকোচ গুলাও পাঠাইয়া দে। নহিলে সম্পাদক বুঝিতে পারিবে না।

কাননিকা। সে গুলা এর পর মল্লিনাথ ঠানদিদির টীকা টিপ্পনীর সহিত টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দিব। রহস্যের কথা ছাড়িয়া বাড়ীর কে কেমন আছে বল।

হরিদাসী। বাড়ীর সবাই ভাল, কেবল একটী মূর্ত্তিমান গান, কাননিকার স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। তারই রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য আমি তোদের বাড়ী আসিয়াছি। নহিলে তোদের সাহেব বিবির বাড়ী আমাকে আর কবে আসিতে দেখিয়াছিস্?—এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া হরিদাসী গমনোদ্যতা হইল। কাননিকা পাছু হইতে ডাকিল, "ঠানদিদি!"

হরিদাসী বলিল, "বাড়ী চলিয়াছি, আবার পাছু ডাকিলি কেন?"

কাননিকা। বহুকালের পরে নাত্নিনীর গৃহে যদি পদধূলিই পড়িল, ত সে ধূলি একটু মাথায় না লইয়া ছাড়িব কি!—

হরিদাসী ফিরিল। কাননিকার মুখ দেখিয়া বুঝিল, সে তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াছে।—বলিল, "কি বলিস্? থাকিব কি যাইব?"

কাননিকা হরিদাসীর হাত ধরিল। তার পর বলিব বলিব করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হরিদাসী তখন আর রহস্য করিল না; রহস্য করিবার সময়ও ছিল না, বাহির হইতে ভামিনী তাহাকে ডাকিতেছিল। বলিল "আর ত আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি এক কথা বলি। বুঝিয়াছি, এ স্বয়ম্বরে তোর বিন্দুমাত্রও মত নাই।"

কাননিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে এই স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা কর। ঠানদিদি! সহস্র লোকের সম্মুখে নিলর্জ্জ হইয়া কেমন করিয়া দাঁড়াইব?"

হরিদাসী। স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তবে তোর গানকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। আর সেই সঙ্গে তোর দাদাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি। এত লেখা পড়া শিখিয়াছিস্, বই লিখিয়াছিস্, উপদেশ দিতে পারিস্, আর প্রেমস্পর্শে এমন হতভম্ব হইয়া গেলি যে, আমারও কাছে সাহস করিয়া মনের কথা খুলিতে পারিতেছিস্ না!

কাননিকা। গানকে তুমি দেখিয়াছ?

হরিদাসী। গানকে বিবাহ করিবি?

কাননিকা। দূর্! গান শুনিব, বিবাহ করিতে যাইব কেন?

হরিদাসী। তবে তোর দাদাকে একটা তানসেনের বাচ্ছা

ধরিয়া আনিতে বলি। তবে আর এ স্বয়ম্বরের কথায় মত দিলি কেন?

কাননিকা। দাদা কি কারও মত শোনে? প্রতিবাদ করিতে গেলে বিপরীত হয়।

হরিদাসী। তোর সে যদি না আসে, স্বয়ম্বর সভায় যাইয়া কি করিবি?

কাননিকা। তা হইলে কদাকার, কুরূপ, মূর্খ, বৃদ্ধ, যাহাকে দেখিলে বিশ্বপ্রেমিকেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়, তাহার গলায় মালা দিব।

হরিদাসী। এত অভিমান লইয়া কেমন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলি?

এই বলিয়া হরিদাসী কাননিকার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "এখন আর অন্য কথা নয়। এর পর যাহা যাহা করিতে বলিব, করিবি। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তোর পূর্ব্বজন্মের বড় সুকৃতি যে, এমন বরের হাতে পড়িবি।—কিন্তু যা, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে!"

কাননিকা হাসিয়া বলিল,—"একেবারে বরই ভুল নাকি ঠানদিদি?"

হরিদাসী। অত দূর নয়, তবে কাছাকাছি বটে। সেখানে জুতা খুলিয়া মল পরিতে হইবে, চেয়ার ছাড়িয়া পিঁড়িতে বসিতে হইবে, উল ছাড়িয়া ফুল ধরিতে হইবে।

কাননিকা। আর ঠাকুরদাদার পাকাচুলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। ঠানদিদি! বল ত এখন হইতেই গেরুয়া ধরি।

চারি দিক হইতে কোলাহল উঠিল। বাড়ীর বাহিরে চারি

দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। বাটীর ভিতরে কুটুম্বিনী-কুল দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। দুই জন হাত-ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোকতরঙ্গে ডুবিল।

এ সংসারে আপনার সামগ্রীটীর আর দ্বিতীয় মিলিল না। আপনার সামগ্রী যেমন সুন্দর, পৃথিবীতে তেমন ধারা সুন্দর আর কই? আমার ছেলেটী যেন চাঁদের শিশুটী, খায় এত ক'টী, ঘুরে বেড়ায় যেন লাটিমটী। ওর ছেলেটা, যেন কোকিলের ছাঁটা, গিলে এতটা, লাফিয়ে বেড়ায় যেন বাঁদরটা। আমার সামগ্রীর তুলনা নাই। তার গালাগালি ও বিকট চীৎকার অন্যের স্বরলয়যোগে গীত হইতেও মধুর। তাহার নখাগ্রভাগের কোমলতার তুলনায় অন্যের অধরপ্রান্তও কঠিন।

ললনাকুল সেনগৃহে আসিয়া যে যার পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কাননিকা সম্বন্ধে আইনমত আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেল। অর্থাৎ, যে আসিল, সেই ভামিনীর সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ পাতাইয়া লইল। এক দণ্ডে কাননিকা সহস্র শ্বাশুড়ীর পুত্রবধূ হইল। অযুত ননদীর বউ-দিদি হইল। কেহ "মা আমার গৃহলক্ষ্মী" বলিয়া বালিকার মুখ চুম্বন করিল। কেহ হাতের মাপ লইল—স্বর্ণকারকে রতন-চূর গড়িতে দিবার জন্য। কেহ কর্ণের ছিদ্র গুণিতে গেল—কয়টী মাকড়ী ধরে দেখিবার জন্য। কেহ নিজের গলার চিক কাননির গলায় পরাইয়া দিল, পুত্রবধূটীকে এই অলঙ্কারখানি যৌতুক দিয়া তার মুখ দেখিবে।

এ সকল পৌরাণিকা। ইহাদের ধারণা, বেশী গহনা পরিতে পাইলেই কাননিকা সন্তুষ্টা হইবে। অপরে আধুনিকা—তাহারা

জানে, অলঙ্কার এখন হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল, ও মুর কোম্পানীর দোকানে। আর কারুকার্য্য এখন হ্যামিল্‌টনে। তুমি এখন পিয়ানো অরগানে।

তাহারা কেহ পায়ের পাঞ্জার মাপ লইল। কেহ বা কেমন পশমী মোজা কাননিকার পছন্দ হয় জানিবার জন্য পায়ের একটু কাপড় গুটাইয়া চরণবেষ্টিনী নীলধূসর বর্ণের মোজা দেখাইল। কেহ বা কালিফর্ণিয়ার সোণায় গড়া র্যাটল্ সর্পের অঙ্গুরি ও তাহার মাথার ব্রেজিলের হীরকখনির সেরা মণি কাননির চোখের উপর ধরিল। কেহ বিদ্যাপতির রূপবর্ণনায় ভুল আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য—

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর-পরশিত
গীম গজমতি হারা
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনীধারা।—

এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিবার জন্য কাননিকার গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিল। কেহ বা গার্ডচেনটা ঝুলাইয়া দিল।

সমবয়সী সহপাঠিনী সখীগণ কাননিকাকে নানা রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনাইতে লাগিল;—যথা,—

১ম। কাননিকার বিদ্যালয় ছাড়িবার পর, আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মনোবিবাদ চলিয়াছে। দুই ভগ্নীতে আর মুখ দেখাদেখি নাই। প্রতিবেশিনী ফ্রান্স জর্ম্মনীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইংলণ্ডের উন্নতিতে তাহারা হিংসায় মরিয়া গেল।

২য়। বড় ভাবনার কথা! রুসিয়া ও জর্ম্মনীর সম্রাটদ্বয়, এক ঘরে দুই দিন ধরিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়াছেন। স্থূল-

তান বেচারীর প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তবে একটু ভরসা, মহারাণী পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, ইউরোপে শান্তি-ভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৩য়। বাঁচাইলি ভাই! নহিলে রাত্রে আমার ঘুম হইত না। মহারাণী একটু আশ্বাস না দিলে, তুরস্কের স্থলতানকে বাঁচাই-বার কোনও ত উপায় দেখিতে পাই না। আহা! বেচারী বড় ভালমানুষ। যে যা বলিতেছে, তাই করিতেছে। তবুও কোন রাজার মন পাইতেছে না।

৪র্থ। ভালমানুষের কাল নেই যে ভাই, যে ভালমানুষ, তারই উপরে যত লোকের অত্যাচার। মাডাগাস্কারের রাণী, ভালমানুষের মেয়ে রাজ্য করিয়া খাইতেছিল। ফ্রান্সের তাহা সহ্য হইল না, রাজ্যটী কাড়িয়া লইল।

৫ম। বলিস্ কি? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর আর রাজ্য নাই! আহা কবে কাড়িয়া লইল? কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলি সখি! না, ফ্রান্স দিন দিন বড় অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে।

৬ষ্ঠ। শুধু কি তাই! সে দিন শ্যাম রাজ্যে কি উৎপাতই না করিল। ভাগ্যে আমাদের শিখসৈন্য ঠিক সময়ে গিয়া বাধা দিয়াছিল।

৫ম। আমাদের শিখ না হইলে ফ্রান্সকে আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। আমাদের শিখ না হইলে কাহাদেরই বা চলে?

৪র্থ। কিন্তু ভাই! শ্যামকে বড়ই যাতনা দিয়াছে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচোয়া। নহিলে শ্যামের কি হইত বল দেখি? ইহাদের মধ্যে একজন অশিক্ষিতা ছিল। সে ইহাদের কথা

শুনিতেছিল। কিন্তু ব্যাপার খানা কি, ভাল বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শ্যামের কথা পড়িতেই তার মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল। শুনিল, শ্যামকে কি এক জন নাম মুখে আসে না কে বড়ই যাতনা দিয়াছে। শ্যাম হয় ত তার পুত্র কিম্বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামকে কে যাতনা দিয়াছে?"

রমণীগণ এক কথাতেই তাকে নিরক্ষরা বুঝিয়া ফেলিল। সুতরাং তার উত্তর দেওয়া একটা অসম্মান মনে করিয়া সে কথায় কাণ দিল না। তৃতীয়া বলিল, "কিন্তু ইতিমধ্যে যে আঘাত দিয়াছে, তার ঘা শুকাতে অনেক কাল লাগিবে।"

অশিক্ষিতা। কোন সর্ব্বনাশীর বেটা! কোন হতভাগা আমার শ্যামের গায়ে হাত দিয়াছে!

তার পর আঙ্গুল মটকাইয়া সেই অত্যাচারীর মৃত্যু কামনা করিল। তাহার হস্তে পক্ষাঘাতের আবাহন করিল। তার পর শ্যাম শ্যাম করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদুষীগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। আর ভাবিল, দেশের কি এত অধঃপতন হইয়াছে? বাড়ীর কাছে শ্যাম, তাহাকেও চিনে না?

এইরূপ হাসি তামাসায়, কথাবার্ত্তায়, পানভোজনাদি ক্রিয়ায় সারাদিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিদাসী কাননিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইল।

সন্ধ্যা সমাগতা। কাননিকা সুসজ্জিতা। রমণীগণ উৎকণ্ঠাকবলিতা। কলিকাতা স্তম্ভিতা। আজ ললিতা লবঙ্গলতা সেনগৃহ হইতে উৎপাটিতা হইয়া কোন এক অনিশ্চিত উদ্যানে রোপিতা হইবে!

পরিচারিকা।

দাড়ীগোঁফ-কামান নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়-অগোচর হইয়া, দ্বারবানের কাছে তাড়া খাইয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে কাননিকাকে লইতে আসিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিল না। প্রিয়-কন্যা ভামিনীই একবার কেরা্যা কেরা্যা বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তার পর জিব কাটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে বৈরাগীঠাকুর মনে করিয়া একটা গান করিতে বলিল। কেহ বদন অধিকারীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, পরিচয় জানিতে চাহিল। কেহ বুড়োর বিবাহ করিতে সাধ গিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না। বরাবর কাননিকার ঘরের দিকে চলিলেন। মনে মনে কিন্তু বড় বিরক্ত হইলেন। আর ভাবিলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে, পোষাকে পরিচ্ছদে, হাসিতে গানে, আহারে ব্যবহারে,—আজকালকার নারীগুলা অনেক উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবাধ্যতা আর বাচালতা, আর স্বাধীনতা, আর কঠিনতা, কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমি নিরঞ্জন না হইয়া যদি আর এক জন বৃদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এই অন্যায় ব্যবহারে আমার মনে যে কষ্ট হইত, সেটা ত ইহারা বুঝিয়াও বুঝিল না।

নিরঞ্জন বরাবর কাননিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কাননিকে!" অনেকগুলি মেয়ে কাননিকাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। ঘেরিয়া এমন কলকল করিতেছিল যে, সে কথা তাহার কাণে গেল না। তাহারা বলাবলি করিতেছিল, কাননিকাকে লইয়া যাইবে কে! হরিদাসীর ধারণা, কাননির দাদা

লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিরঞ্জন সেন এমন বোকা নয়, কাননিকার স্বয়ম্বরের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উদ্যোগ করিয়া, এই সামান্য কাজটা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই দেখ না, কাননিকাকে লইতে লোক আসে।

কাননিকাকে কেমন ধারা লোকে লইয়া যাইবে? কাননিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি সুন্দর চাকর। আর যদি দাদা নিজেই লইয়া যায়? তাও কি কখন হইতে পারে? দাদা কি একটা হেঁজি পেঁজি লোক? সে কি জানে না, নাতিনীকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে লোকে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিবে! যদি তার মত একটা বুড়ো লইতে আসে? হরিদাসী সেই বৃদ্ধকে আর ঠাকুরজামাইকে এক দড়ীতে বাঁধিয়া, মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিবে। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন। কথার মর্ম্ম বুঝিয়া কাননিকে ডাকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, থাকিব কি পলাইব? কিন্তু এখন অন্য লোক কোথা পাই? যে হরিদাসী, সে আমাকে দেখিলে টীটকারিতে অস্থির করিবে।

এমন সময় একটী সুন্দরী জানালার ফাঁক দিয়া নিরঞ্জনকে দেখিতে পাইল। অমনি হরিদাসীকে বলিল, "কাননিকাকে লইতে একজন বৃদ্ধ আসিবে। আমি গণিয়া দেখিলাম।" হরিদাসী বলিল, "মিথ্যা কথা!" সমুদায় স্ত্রীগণ হরিদাসীর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা।" কাননিকা বলিল, "মিথ্যা কথা।"

রমণী বলিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল "বাজী?"

সমুদায় স্ত্রীগণ বলিয়া উঠিল, "বাজী?"

হরিদাসী বলিল,—"তাহা হইলে কাননিকাকে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিব।"

রমণী বলিল, "দিবে?"

হরিদাসী বলিল, "নিশ্চয় দিব। কি বলিস্ কাননি?"

কাননিকা। সে যদি ঠাকুরদাদা হয়?

রমণী। কখন নয়। তোর দাদার ত দাড়ী গোঁফ আছে?

হরিদাসী। আছে বলে আছে? ঠাকুরজামাই মুখে উলুবনের ক্ষেত করিয়াছে।

রমণী। এ বৃদ্ধের গোঁফ দাড়ী কামান। মুখ খানা বাঙ্গলা পাঁচের মতন।

হরিদাসী। তবে ত সে ঠাকুরজামাই নয়ই। তারে দেখিলে নারদঋষি বলিয়া ভ্রম হয়।

তখন সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিল। কই, কে কোথায়? কেউ ত নাই! রমণী বলিল, "আমি ঠিক দেখিয়াছি। এইখানে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছিল।" সকলে, তাহাকে লেডি হ্যামলেট, কিম্বা হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তা বলিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া নিরঞ্জন ছুটিয়া পলাইয়াছেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে গিয়া বলণ্টিয়রগণকে ডাকাইলেন। তাহারা ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন কাননিকাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্য, তাহাদের মধ্যে এক জনকে অনুরোধ করিলেন। সকলে এ উহাকে, সে তাহাকে, যাইতে অনুরোধ করিল। কেহই নিজে পরিচর্য্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনা পয়সায় শুদ্ধমাত্র সহৃদয়তাপ্রণোদিত হইয়া, সভার কার্য্য করিতেছে বলিয়া কি কাননিকার আশাটি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছে? পরিচারক

হইলে ত আর সে আশা নাই! নিরঞ্জন দেখিলেন, নিরুপায়; কে যায়! এই মাথায় মাথায় কারে পাই? একজন বলণ্টিয়ার বলিল, "বাগানের প্রান্তভাগে একটী চাকরজাতীয় ছোকরা বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিতে মন্দ নয়। তাহাকে দেখিব কি?"

নিরঞ্জন। দেখ দেখ, শীঘ্র দেখ! তাহাকে কিছু দিবে স্বীকার করিয়া আন। সর্ব্বনাশ হইল, আমার মান সম্ভ্রম সব গেল। বুঝি লোক হাসাইলাম।

বলণ্টিয়ার ছুটিল। নিরঞ্জন অন্য বলণ্টিয়ারগণকে বলিলেন, "তোমরা না হয় সেই বামুনগুলার সন্ধান কর।"—তাহারাও চারি দিকে ছুটিল। প্রথম বলণ্টিয়ার ফিরিল; নিরঞ্জন বলিলেন, "খবর কি?"

বল। আমি তাহাকে আট আনা পর্য্যন্ত কবুল করিলাম। সে ষোল আনা না পাইলে আসিতে রাজি হয় না।

নিরঞ্জন। আরে তাই দেব বল না ছাই! এখন কি আর টাকার মায়া করিলে চলে!

বলণ্টিয়ার ছুটিল, এবং একটু পরেই চাকরকে ধরিয়া আনিল। নিরঞ্জন বলিলেন "রে চাকর! ষোল আনাই পাইবি। এই বাবু যা বলেন, তাই কর।" চাকর মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "ইহাকে 'লিভারি (livery)' পরাইয়া দাও।" রাগান্ধ নিরঞ্জন আর কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না।

বলণ্টিয়ারকে বলিলেন—"তোমরা যাহা করিতে হয়, কর। তোমাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। আমার অসুখ করিতেছে। আমি শয়ন করিতে চলিলাম।"

আট্টাও বাজিল, অমনি ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। বাদনও থামিল, অমনি যবনিকা উত্তোলিত হইল। যবনিকাও উঠিল, অমনি ভর্তৃদারিকারূপিণী কাননিকা, চাকরের হাত ধরিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

কাননিকাও প্রবিষ্টা হইল, অমনি চারি দিক হইতে শ্রবণ-ভেদী চড় চড় শব্দ উঠিল।

ভুবনমোহিনীর দর্শনমাত্রেই সভ্যমণ্ডলীর হৃদয় যুগপৎ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। করতালির শব্দ ছাপাইয়া সে দুরু দুরু ধ্বনি ভাবুকের কাণে গেল। পরিচারকের করে করভার ন্যস্ত করিয়া সুন্দরীর লাজমন্থর গমন প্রতিপাদবিক্ষেপে হৃদয় কাঁপাইয়া সভা-স্থলে একটা অপূর্ব্ব ভাব তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। প্রতিপ্রাণ নীরব চীৎকারে বলিয়া উঠিল,

"মদিরলোচনে! লজ্জানত বদন তুলিয়া একবার আমার পানে চাহিবে কি ?"

পরিচারকও অবনতবদন। মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কাননিকার হাত ধরিয়া, সভামধ্যস্থলে সেই কৃত্রিম প্রস্রবণতীরে লইয়া চলিল। যেন লজ্জা লজ্জাকে টানিতেছিল, অন্ধ পঙ্গুকে পথ দেখাইতেছিল।

যাইতে যাইতে কাননিকা শতবার দাঁড়াইল। শত স্থানে রূপ ঝরিয়া যেন শত সুধাসরসীর সৃষ্টি করিল। দেহযষ্টির কোমলতায় বালিকার প্রতি পদক্ষেপে বিলাসচাপল্য, সেই সহস্র দর্শকের প্রাণে সহস্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই মনে করিল, সুন্দরী তাহারই জন্য এইরূপ করিতেছে। "অহো কামী স্বতাং পশ্যতি।"

কামনাপরবশ বরকুল বরাননার নয়ন দুটী নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিল। কেহ এক গাছি ছড়ির মৃগমুখপ্রান্ত অধরে লাগাইয়া ঈষৎ ঈষৎ কাঁপাইতে লাগিল। কেহ বা দশনপংক্তির সৌন্দর্য্যে কাননিকার হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য অঙ্গুলিদংশন ছলে দাঁত বাহির করিল। কেহ বা বিশাল নয়নে বিধাতার-শিল্পকৌশল বুঝাইবার জন্য হাত দিয়া মুখখানি ঢাকিয়া শুধু চক্ষু দুটি বাহির করিয়া রহিল। কেহ বা আলোক ও ছায়া মাখামাখি হইলে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা হয় বুঝিয়া, চাঁদমুখখানি চুণ করিয়া, কাননিকার অঙ্গে অপাঙ্গ রাখিয়া, কোন এক দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ লঙ্কা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। কাননিকাকে দেখিয়াই সে চোখে লঙ্কা দিল। চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল; যদি কবিতারসার্দ্রা করুণাময়ী তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে! আর এক বাহুবল্লীতে অঞ্চল ধরিয়া, অপর বাহুলতায় তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, "আর কেঁদ না, আর কেঁদ না", বলিয়া চোখ মুছায়। সাহেবের ঘুসিতে কাহারও নাক থ্যাঁতলাইয়া গিয়াছিল। সে কমলসদৃশ পূর্ব্ব মুখশ্রীটি কাননিকাকে দেখাইবার জন্য একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল; সাহেব অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিল, সেখানি আর হাতে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। সহসা সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরিচারক কথা কহিল।—"হে বাবুরা! কুমারী আপনাদের নমস্কার করিতেছেন।" সকলে প্রত্যভিবাদন করিল।

তখন পরিচারক একখানি খাতা ও পেন্‌সিল হাতে করিয়া,

প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া, পরিচয় লইতে লাগিল। সেই প্রস্রবণের ধারে, কচু, ক্রোটন, ঝাউ-শিশু, তাল-শিশু, নানা জাতীয় বিলাতী গুল্মবনের মাঝারে, একটী বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত চেয়ারে রচিতবিবাহবেশা পতিংবরা বসিয়া রহিল। সকলের পরিচয় লইয়া পরিচারক কাননিকার কাছে ফিরিল।

তখন,

আগে চলে বেত্রধর পিছে চলে বালা
এক হস্তে গন্ধপাত্র অন্য হস্তে মালা।
টেবো গাল মুদি ভুঁড়ি বসে এক বর,
তার কাছে কন্যা লয়ে গেল বেত্রধর।
বেত্রধর কুমারীরে দেয় পরিচয়,
রাজ্যেশ্বরে মালা দিতে মতি যদি হয়,
দেখ এই বসে আছে পুরুষপ্রধান,
ইহারে বরণ করে রাখ নিজ মান।
হোমরাও চোমরাও ইটালির রাজা,
বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দাও এরে সাজা।
হরিশ্চন্দ্র দান করে হয়েছে চণ্ডাল,
বলি রাজা দান করে ঢুকেছে পাতাল;
ইনি কিন্তু বড় বড় ফণ্ডে করে দান
রাতারাতি মহারাজা ইন্দ্রের সমান।
দান করে ধন বাড়ে শুনেছ কি ধনি?
দান করে পুঁটে তেলি হয় নরমণি?
ইহারে বরণ যদি কর বরাননি!
একদিনে হয়ে যাবে ইটালীর রাণী।

"ইটালীর রাণী হব ইটালীর রাণী!"
উৎফুল্লা হইয়া কথা কহিলা কাননি।
"ভূমধ্যসাগরে যেই পাদুকারূপিণী,
মেদিনীর অলঙ্কার রোমের জননী;
যাহার গৌরবরবি দিগন্তে বিকাশ,
সেই রোমে আমি কিগো রব বারমাস?"
অত দূর নয় তবে কাছাকাছি বটে,
টাইবার * নয়, পদ্মপুকুরের তটে।
তার তীরে এ ইটালী, নাই সেথা রোম,
চারি ধার বেড়ে তার আছে মুচি ডোম।
যেমন ডোমের নাম শুনে কাননিকা,
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি হয়ে গেল ফিকা।
ভাব বুঝি বেত্রধর অন্য দিকে যায়,
ছল্ ছল্ চোখে রাজা ফেল্ ফেল্ চায়।
অন্য মঞ্চ পাশে তবে লইয়া কুমারী,
বেত্রধর বলে তারে সম্বোধন করি,—
এই যে দেখিছ বালা পুরুষপুঙ্গব
পা হইতে মাথা এঁর উচ্চশিক্ষা সব।
উচ্চশিক্ষা চাঁদ মুখে, উচ্চশিক্ষা দাঁতে,
উচ্চশিক্ষা হাতে, আর উচ্চশিক্ষা পাতে।
দয়া করে দাও যদি এর গলে মালা
ভুগিতে হবে না কভু বিরহের জ্বালা।

---

* টাইবার—ইটালী দেশের নদী। ইহার তীরে রোম নগর অবস্থিত।

কি ভোজনে কি শয়নে কি ভ্রমণে পথে
সকল সময় তুমি রবে সাথে সাথে।
প্রাণেশ বিদেশে যদি যায় কাননিকা,
তথাপি হবে না তুমি প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
সভায় সমিতি-গর্ব্ভে বিজন কাননে
নৈনিতাল সিমলায় অথবা লণ্ডনে
মান্দ্রাজ বোম্বাই কিম্বা ইলোরা-গহ্বরে
প্যারিসে প্রান্তরে কিম্বা গাছের উপরে
যেথা রবে গুণমণি, তুমি রবে ধনি,—
প্রফুল্লা নলিনী রবে দিবস রজনী।
"স্বামী সঙ্গে রব যদি নিশি দিন মানে
ভাল ভাল পত্র আমি লিখিব কেমনে ?
কবিতা ভুলিয়া যাব, ভুলে যাব গান,
ভুলে যাব দীর্ঘশ্বাস, ভুলে যাব মান।"
এই বলে অতি মৃদু শির নোয়াইয়া
গজেন্দ্রগমনে বালা চলিল চলিয়া।
বেত্রধর নিরুপায় পাছু পাছু যায়,
আর এক বরবরে তখন দেখায়।
দুঃখিনী এ ভারতের দরিদ্র সন্তান,
উৎসর্গ তাদের তরে করেছে যে প্রাণ,
নৈতিক এ সন্ন্যাসীর হ'তে সন্ন্যাসিনী
ইহার গলায় মালা দিবে কি কাননি ?
সন্ন্যাসীর নাম শুনে করনাক মনে,
সারাটি বছর ইনি ভ্রমেন কাননে।

সন্ন্যাসিনী নাম বটে করিবে ধারণ,
হবেনাগো পদব্রজে করিতে ভ্রমণ,
যাপিতে হবে না নিশি নীলাকাশতলে,
তিতিতে হবে না কভু বরষার জলে,
বনে বনে পথে পথে অনাহারে থাকি
খাইতে হবে না কভু কষা আমলকী!
গান গেয়ে ভিক্ষা-ঝুলি কমণ্ডলু করে
ফিরিতে হবে না কভু গৃহস্থের দ্বারে।
পাবে তুমি বড় বাড়ী, বড় জুড়ী গাড়ী,
পরিতে পাইবে তুমি রাঙা রাঙা শাড়ী।
বর পানে অল্প চেয়ে মৃদু হাসি হাসি,
বেত্রধরে সম্বোধিয়া কহিলা রূপসী—
"বড়ই বিস্মিতা আমি তোমার কথায়
উপার্জ্জন কিসে হয় দরিদ্রসেবায়?
গাড়ী জুড়ী বাড়ী কোথা পেলে বল ত্বরা,
যক্ষের কি ধন ঘরে আছে ভারা ভারা?
নতুবা ভিখারী ভজি' কার ভরে পেট?"
কথা শুনে লাজে বর মাথা করে হেঁট।
এই স্বয়ম্বর কথা অমৃত-সমান,
দ্বিজ নরোত্তম গায় দেখে পুণ্যবান।

হাতে মনোহর মালা উধাও চলিল বালা,
কত বর পার হয়ে যায়!
কালেক্টার মেজেষ্টার কত জজ ব্যারিষ্টার
কেহ সে হৃদয় নাহি পায়।

জীবনঘাতিনী মালা কারো না পরশে গলা,
সমীরে উড়িয়া যেন চলে ;
কত রবি কত তারা কেঁদে কেঁদে হল সারা
নলিনী গলিয়া গেল জলে।
কত অগতির গতি কত সমাজের পতি
পাত্র মিত্র ব্রাহ্মণঠাকুর,
নভেল নাটক গাথা ইতিহাস উপকথা
নারীকণ্ঠ বাজখাঁই সুর,
কুমারীর অবজ্ঞায় মুখ তুলে নাহি চায়
চুপ করে ভেউ ভেউ কাঁদে,
রূপে গুণে অনুপমা তবু না বুঝিল রামা
পড়িল না রোদনের ফাঁদে।
আগে আগে উজলিয়া পাছুতে আঁধার দিয়া
ধীরে চলে পূর্ণশশিকলা,
শেষ হ'ল বরকুল স্বয়ম্বরে হল ভুল,
কর হতে খসিল না মালা !

এ কি! হইল কি! এই সহস্র বরের মধ্যে এক জনও কাননিকার পছন্দ হইল না !

পরিচারক কাননিকাকে সঙ্গে করিয়া চেয়ারে লইয়া বসাইল। তার পর সভাস্থ সকলকে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। "বাবুরা, তোমরা আপনারা হুকুম করেন ত, আমি একটা কথা বলি।" কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিল। কেহ বলিল, "বল।" কেহ বা বলিল, "তুই আবার কি বলবি ?"

পরিচারক এবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল, "আমি হুজুরদের দাস, তায় মুখ্যু, শুধু ষোল আনার লোভে এইখানে এসেছি। আমি আর কি বলব? তবে নিজগুণে কৃপা করে যদি আপনারা চাকরের কথা শোন।" এই বলিয়া পরিচারক সকল দেশের বিবাহপ্রথার সঙ্গে ভারতের প্রথার আলোচনা করিল। কোন দেশের বিবাহে নারীদিগের পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। ভারতের কথা ত ছাড়িয়া দিতেই হইবে। ভারত ত অধঃপাতে গিয়াছে। পরিচারক জাতিকে একটি পাঁচ বছরের মেয়ে আনিতে কত টাকাই না খরচ করিতে হয়। কিন্তু ভারতের স্বয়ম্বর-প্রথায় কন্যাকে আগে কি স্বাধীনতাই দেওয়া ছিল! কন্যা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। বাবুরা এখন সেই স্বাধীনতা দিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। খানিক স্বাধীনতা মার্কিন হইতে, খানিকটা ইংরাজী, ফরাসী, চীনী, জাপানী, হিন্দুস্থানী হইতে, এই রকম পাঁচটা সাজী হইতে স্বাধীনতা-ফুল তুলিয়া, আমাদের দেশে বিবাহ-প্রথার তোড়া তৈয়ারি হইয়াছে। তবুও যেন কেমন কেমন বাধা বিপত্তি তাহার সহিত জড়ান আছে। আজ কিন্তু সেটি নাই। বরকুলের মধ্যে ছত্রিশবর্ণই বিদ্যমান। সকলেরই ত কাননিকালাভের আশা ছিল।—কিন্তু কেহই কাননিকার মনোমত হইল না। বাকী আছে শুধু দাস। এখনও আশা আছে সেই দাসের। দাস একবার এই রূপজ্ঞানগর্ব্বিণী বালিকাকে লজ্জা দিবে কি?"—

সকলেই কাননিকার উপর চটিয়া ছিল। কাননিকাকে অপমানিতা করিবার জন্য সকলে একবাক্যে অনুমতি দিল। *কে না ভাবিয়াছিল, রাজার ভাগ্যে যে ধন মিলিল না, সে কি দাসের ভাগ্যে মিলিবে?*

অনুমতি পাইয়া বেত্রধর বেত গাছটি ভূমিতে রাখিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে কাননিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ওগো রাজকন্যে! দাস কুলে আমার জন্ম। আমি এই বাগানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে ছিলাম। শুধু বোল আনার লোভে আমি আসিয়াছি।" অন্যের মুখের ভাব দেখিবার জন্য পরিচারক একবার মঞ্চপানে চাহিল। অমনি অনেকে অঙ্গুলি দেখাইয়া উৎকোচের ইঙ্গিত করিল।

কাননিকা জনান্তিকে বলিল, "আর যা বলিবার আছে, শীঘ্র বল। আমি আর বসিতে পারি না। আমার মাথা ঘুরিতেছে।" এই বলিয়া দাসের মুখ পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বরকুল স্থির করিল, কন্যা পতি বাছাই করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে। দুই এক জন বলিল,—"বেশ বেশ, ভেবে চিন্তে স্বামী বাছিয়া লও। তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।"

দাস জনান্তিকে বলিল, "তবে প্রস্তুত হও। দিদি বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। তোমার হরিদাসী ঠানদিদি আমারই সহোদরা। এ কথা ত তার কাছেই শুনিয়াছ।"

কাননিকা। তোমায় আর পরিচয় দিতে হইবে না। তুমি বড় নিষ্ঠুর।

দাস। শাস্তি দাও।

কাননিকা বলিল,—"প্রিয়তম! বাপ মা—সকল পাইবার প্রত্যাশায় কি তোমাকে হৃদয় দিয়াছিলাম। নির্দ্দয়! তোমার জন্য যে আমি সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছিলাম। মা মাতামহ সবাইকেই ভুলিতেছিলাম।"

প্রেমিকের নির্জনতা কি শুধু নিকুঞ্জে? শুধু কি অগণ্যতারকাশোভিনী রজনীর ঘনান্ধকারনিষেবিত অঙ্কে? হে প্রেমিক

কত দিন তোমার বিস্ফারিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত জীব কত বার যাতায়াত করিয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? প্রেমাবৃতলোচনার দৃষ্টিপথ হইতে দেখিতে দেখিতে সহস্র লোক অন্তর্হিত হইল। কাননিকা দেখিল শুধু একজন।—সেই এক-জনকে নির্জনে পাইয়া বালিকা তার হাত ধরিল। বলিল, "নিষ্ঠুর! যথার্থই আজ তোমাকে শাস্তি দিব।" এই বলিয়া তাহার গণ্ডদেশে—আ ছি ছি!—হাঁ হাঁ!—কর কি কর কি!—একটি চুম্বন করিল।—অমনি সকলে "এইও, এইও!"—করিয়া একটা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে শব্দ কাননিকার কাণে গেল। তাহার চমক ভাঙ্গিল। কি করিয়াছি ভাবিয়া, লজ্জিত হইল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। তাই সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার বলিল, "হে দাস! আমি তোমার দাসী। হে চন্দ্র সূর্য্য, হে সভাস্থ লোকগণ! শুনিয়া রাখ, আজ হইতে আমি এই পরি-চারকের পরিচারিকা।

বিশ্বাসঘাতকতা, জুয়াচুরি, ডাকাতি, মাররে, ধররে! শব্দ চারি দিক হইতে যুগপৎ উত্থিত হইল।—কাননিকা সেই গোলমালের ভিতরে দাসের গলায় মালা দিল। অমনি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বাহিরে "আরম্স্" শব্দ হইল। গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া শান্তিরক্ষক সারবন্দি দাঁড়াইল। দাসদাসী চক্ষের নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে কলিকাতার পথে কেবল শব্দ হইল, দুপ দুপ—কাননিকার সন্ধানে এত লোক ছুটিয়াছিল। ভাগীরথীর জলে কেবল শব্দ হইল, ঝুপ ঝুপ—এত লোক তাহাকে খুঁজিতে জলে ঝাঁপ খাইয়াছিল। কাননিকা নিজের স্কন্ধে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক-রাশি বহন করিয়া, লোকশিক্ষা দিল। কিন্নরে কণ্ঠ ছাড়িল,

বক্তা বাক্য ঝাড়িল, জিমনাষ্ট বারে ছুলিল, তবু কাননিকা ফিরিল না। কবি-কুরঙ্গ কত লাফাইল ;—Ode to lark লিখিল, সনেটে কাগজ পূরাইল, কাতরে করুণা ভিক্ষা করিল, তবু কাননিকা মুখ তুলিয়া চাহিল না। গন্ধশালতরুর মূলোচ্ছেদ হইল, পয়ার, ত্রিপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, ললিতমালতীতে কাব্য-কানন ভরিয়া গেল, তবু কাননিকা তাহাতে পা বাড়াইল না। ভ্রান্তিমান, বিভাবনা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা—ভাল ভাল ফুল-অলঙ্কার ও ফুলমালা হস্তে কত ভাবুক কত পত্রিকা-রাজ্যে কত ঘুরিল, তবু কাননিকার সন্ধান মিলিল না।

শোকে দুঃখে জাগরণে, কোন দিন অনশনে, কোন দিন অতি ভোজনে, সমাজের বিসূচিকা হইল। সেই রোগেই সে পটোল তুলিল। আবার সত্য যুগ ফিরিয়া আসিল। তখন,

মেষশিশু ম'লে দেয় বাঘিনীর কাণ,
পশুরাজ বিড়ালের স্তন্য করে পান ;
মন সাধে গায় কাক, শুনিছে শৃগাল,
নীরবে বসিয়া পিক চাটে তার গাল।
বানরী মানবে ধ'রে মুখ চুমি' বলে—
'এত কাল মায়ে ভুলে কোথা ছিলি ছেলে ?'
সাপ নাচে, জেটী হাঁচে, লূতা ধরে গান ;
সবাই সমান ভাই ! সবাই সমান !

সম্পূর্ণ।